হাদীস ও সুন্নাহর
মূল্যমান
Islamicalo.com

‘সুন্নাহ’র অর্থ

উলামাদের পরিভাষায় সুন্নাহর একাধিক অর্থ থাকে ঃ-

১। সুন্নাহর আভিধানিক অর্থ হল, তরীকা, চাহে তা ভালো হোক অথবা মন্দ।

২। ফকীহদের পরিভাষায় সুন্নাহ (সুন্নত) হল, যা করা মুস্তাহাব; যা করলে সওয়াব আছে এবং ছাড়লে গোনাহ নেই, যার বিপরীত হল মাকরূহ।

৩। মুহাদ্দেসীনদের পরিভাষায় সুন্নাহ হল, হাদীসের প্রতিশব্দ। অর্থাৎ, মহানবী ﷺ-এর প্রত্যেক কথা, কাজ, মৌনসম্মতি, চারিত্রিক অথবা দৈহিক গুণাবলী কিংবা তাঁর জীবন-চরিত; চাহে তা নবুঅতের পূর্বের হোক অথবা পরের।

৪। মহানবী ﷺ-এর তরীকা, আদর্শ ও পথনির্দেশকে (প্রত্যেক সৎকর্ম, আদব ও সচ্চরিত্রতাকে) সুন্নাহ বলা হয়। যা মানের দিক থেকে ওয়াজেবও হতে পারে অথবা মুস্তাহাব, আকীদাগত ব্যাপার হতে পারে অথবা ইবাদত, ব্যবহার ও চরিত্রগত কোন ব্যাপার হতে পারে।

৫। সুন্নাহ হল, কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ অনুযায়ী আমল করা, সলফে-সালেহীন (সাহাবার) অনুকরণ করা এবং হাদীসের অনুসারী হওয়া। *(আল-হুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ ২/৪২৮)*

৬। আবুল কাসেম আসবাহানী বলেন, ভাষাবিদরা বলেছেন যে, সুন্নাহ মানে জীবন-চরিত ও তরীকা। প্রচলিত কথায়, ‘অমুক সুন্নাহর অনুসারী’ অর্থাৎ, সে তার কথায় ও কাজে কুরআন ও হাদীসের অনুসারী। যেহেতু সুন্নাহ (তরীকা) আল্লাহ ও তদীয় রসূলের বিরোধী হতে পারে না।

৭। ইবনে রজব বলেন, সুন্নাহ হল চালু পথের (অনুসৃত তরীকার) নাম। আর তা হল, তিনি ও তাঁর খুলাফায়ে রাশেদীন যে আকীদা, আমল ও বক্তব্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাই শক্তভাবে ধারণ করার নামান্তর। এটাই হল পরিপূর্ণ সুন্নাহ। এ জন্যই পূর্বকালে সলফগণ ঐ সকল অর্থ ছাড়া ‘সুন্নাহ’ শব্দ ব্যবহার করতেন না। অনুরূপ কথারই অর্থ হাসান (বাসরী) আওযাঈ ও ফুযাইল বিন ইয়ায থেকে বর্ণিত আছে। *(জামেউল উলূমি অল-হিকাম ঃ হাদীস নং ২৮)*

সুন্নাহর মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব

মুসলিমের নিকট সুন্নাহ, হাদীস ও তরীকায়ে মুহাম্মাদীর গুরুত্ব বিশাল। মহান আল্লাহর কিতাবের পর তাঁর প্রেরিত রসূল ﷺ-এর তরীকা ছাড়া আর কার তরীকা উত্তম হতে পারে মুসলিমের কাছে? অবশ্য এই গুরুত্ব পাওয়ার বিভিন্ন কারণ আছে, যা নিম্নরূপ ঃ-

১। সুন্নাহ হল এক প্রকার অহী।

অহী মাতলূ হল কুরআন মাজীদ। আর অহী গায়র মাতলূ হল সুন্নাহ। মহানবী ﷺ-এর উপর যে অহী আল্লাহর শব্দে সংরক্ষিত হত এবং যার তেলাঅতে প্রত্যেক অক্ষরের বিনিময়ে ১০টি করে সওয়াব পাওয়া যায়, তাই হল কুরআন। আর কুরআন ছাড়া যে শরয়ী নির্দেশ নিয়ে অহী নাযিল হত এবং যা মহানবী ﷺ নিজ ভাষায় ব্যক্ত করতেন তাই হল সুন্নাহ। বলা বাহুল্য এ কথা বিদিত যে, তিনি শরীয়তের ব্যাপারে নিজের তরফ থেকে কিছু বলতেন না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ ۝٣ إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ ۝٤ ﴾ (النجم ٣-٤)

অর্থাৎ, সে মনগড়া কথা বলে না। তা তো অহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়। *(সূরা নাজ্‌ম ৩-৪ আয়াত)*

মহানবী ﷺ-এর উপর যে ধরনের অহী নাযিল হত তা মোটামুটি ৬ প্রকারেরঃ-

(ক) স্বপ্নে তাঁর উপর অহী অবতীর্ণ হতো।

(খ) জিবরীল অদৃশ্য থেকেই তাঁর হৃদয়ে অহী প্রক্ষিপ্ত করে দিতেন।

(গ) জিবরীল মানুষের আকৃতি ধারণ করে তাঁকে সরাসরি সম্বোধন করতেন।

(ঘ) জিবরীলকে তাঁর নিজ সৃষ্টিগত আকৃতিতে দর্শন করে অহীপ্রাপ্ত হতেন।

(ঙ) অহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় পাথরে শিকল পড়ার শব্দের মত শব্দ শোনা

যেত। আর এই অহীর সময় তিনি বড় কষ্টবোধ করতেন এবং তাঁর দেহ ঘেমে যেত।

(চ) আল্লাহর নৈকট্যে তাঁর সহিত পর্দার অন্তরাল হতে সরাসরি নির্দেশ হয়েছিল।

উক্ত সকল প্রকার অহীর মাধ্যমে মহানবী ﷺ জ্ঞান ও নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। আর সেসবই হল সুন্নাহ বা হাদীস। যা আসলে মহান আল্লাহরই নির্দেশ।

মহানবী ﷺ বলেন, "শোন! আমাকে কুরআন দান করা হয়েছে এবং তারই সাথে তারই মত (সুন্নাহ) দান করা হয়েছে। শোন! সম্ভবতঃ নিজ গদিতে বসে থাকা কোন পরিতৃপ্ত লোক বলবে, 'তোমরা এই কুরআনের অনুসরণ কর; তাতে যা হালাল পাও, তাই হালাল মনে কর এবং তাতে যা হারাম পাও, তাই হারাম মনে কর। অথচ আল্লাহর রসূল যা হারাম করেন তাও আল্লাহর হারাম করার মতই।---" *(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমী, মিশকাত ১৬৩নং)*

২। সুন্নাহ হল কুরআনের ব্যাখ্যা

সুন্নাহ না থাকলে কুরআনকে সঠিকরূপে বুঝতে উম্মাহ সক্ষম হতো না। অনেক আয়াতের অর্থ নিয়ে মানুষ বিভ্রান্তিগ্রস্ত হত।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَوۡمِهِۦ بِلِسَانِ لِيُبَيِّنَ لَهُمۡ﴾ (ابراهيم ٤)

অর্থাৎ, আমি প্রত্যেক রসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে প্রেরণ করেছি, তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য। *(সূরা ইবরাহীম ৪ আয়াত)*

﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ ٤٤﴾

অর্থাৎ, তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা করে। *(সূরা নাহল ৪৪ আয়াত)*

﴿وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٗ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ ٦٤﴾ (النحل ٦٤)

অর্থাৎ, আমি তো তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি যারা এ বিষয়ে মতভেদ করে তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এবং মুমিনদের জন্য পথনির্দেশ ও করুণা স্বরূপ। *(সূরা নাহল ৬৪ আয়াত)*

উদাহরণ স্বরূপ ফজর (সেহরীর শেষ সময়) চেনার ঘটনা। মহান আল্লাহ বলেন,

)

(

অর্থাৎ, আর তোমরা পানাহার কর, যতক্ষণ পর্যন্ত না কালো সুতা থেকে ফজরের সাদা সুতা তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে। অতঃপর তোমরা রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। *(সূরা বাক্বারাহ ১৮৭ আয়াত)*

উক্ত আয়াতে উল্লেখিত কালো সুতা ও সাদা সুতা বলে রাতের অন্ধকার ও দিনের শুভ্রতাকে বুঝানো হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে আদী বিন হাতেম কর্তৃক বর্ণিত, উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলে তিনি (মাথায় রুমালের উপর ব্যবহার্য) একটি সাদা ও একটি কালো মোটা রশি (বালিশের নিচে) রাখলেন। রাত্রি হলে তিনি লক্ষ্য করলেন, কিন্তু (কোন্‌টা সাদা ও কোন্‌টা কালো) তা স্পষ্ট হল না। সকাল হলে তিনি এ কথা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলেন। তিনি ﷺ তাঁকে বললেন, "তোমার বালিশ তাহলে খুবই বিশাল! কালো সুতা ও সাদা সুতা তোমার বালিশের নিচে ছিল?!" *(বুখারী ৪৫০৯নং)* অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তার মানে হল, রাতের অন্ধকার ও দিনের শুভ্রতা।" *(বুখারী ১৯১৬, মুসলিম ১০৯০নং)*

আল্লাহ তাআলা বলেন,

(   )

অর্থাৎ, যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুল্‌ম দ্বারা কলুষিত করেনি, তাদের জন্যই নিরাপত্তা এবং তারাই সৎপথপ্রাপ্ত। *(সূরা আনআম ৮২ আয়াত)*

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলেন। 'এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হল, তখন মুসলিমদের নিকট বিষয়টি কঠিন মনে হল। বলল, 'আমাদের মধ্যে কে আছে যে নিজের উপর যুল্‌ম (অন্যায় বা পাপ) করে না?' তা শুনে রসূল ﷺ বললেন, (তোমরা যে যুল্‌ম মনে করছ) তা নয়। বরং তা (সবচেয়ে বড় যুল্‌ম) কেবলমাত্র শির্ক। তোমরা কি পুত্রকে সম্বোধন করে লুকমানের উক্তি শ্রবণ করনি? (তিনি তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন),

( )

অর্থাৎ, হে বৎস্য! আল্লাহর সহিত শির্ক করো না, নিশ্চয় শির্ক বড় যুল্‌ম। *(বুখারী ও মুসলিম)*

বলা বাহুল্য, সাহাবাগণ যা বুঝেছিলেন, আসলে কুরআনের বক্তব্য তা ছিল না। আসল বক্তব্য স্পষ্ট হল মহানবী ﷺ-এর ব্যাখ্যা থেকে।

মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার অলীর বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করবে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব। বান্দা যা কিছু দিয়ে আমার নৈকট্য লাভ করে থাকে তার মধ্যে আমার নিকট প্রিয়তম হল সেই ইবাদত, যা আমি তার উপর ফরয করেছি। আর সে নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। পরিশেষে আমি তাকে ভালোবাসি। অতঃপর আমি তার শোনার কান হয়ে যাই, তার দেখার চোখ হয়ে যাই, তার ধরার হাত হয়ে যাই, তার চলার পা হয়ে যাই! সে আমার কাছে কিছু চাইলে আমি অবশ্যই তাকে তা দান করি। সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দিয়ে থাকি। আর আমি যে কাজ করি তাতে কোন দ্বিধা করি না -যতটা দ্বিধা করি একজন মুমিনের জীবন সম্পর্কে; কারণ, সে মরণকে অপছন্দ করে। আর আমি তার (বেঁচে থেকে) কষ্ট পাওয়াকে অপছন্দ করি।" *(বুখারী ৬৫০২নং)*

কিন্তু বিদিত যে, কোন্‌টা ফরয, কোন্‌টা নফল তা চেনার উপায় সুন্নাহর নির্দেশ।

এ কথা একটি সাধারণ লোকেও বুঝতে সক্ষম হবে যে, জীবনে চলার পথে কেবলমাত্র কুরআনই আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়। কেননা, কুরআনে সকল কথার বর্ণনা থাকলেও, সমস্ত কথার বর্ণনা বিস্তৃত নয়, বিশদ নয়। আর সেই ক্ষেত্রে দরকার পরে সুন্নাহর। যেমন; নামায ফরয হওয়ার কথা কুরআন থেকে জানা গেলেও, তা কত পরিমাণে কোন্‌ সময় কি নিয়মে ফরয, তা সুন্নাহ থেকেই জানতে হয়। যাকাত আদায় ফরয কুরআনে বলা হলেও, তা কত পরিমাণে কোন্‌ সময় কি নিয়মে ফরয, তা সুন্নাহ থেকে বুঝে নিতে হয়। আর এই শ্রেণীর অনেক আমলই।

এখানে একটি সতর্কতার বিষয় যে, কোন বিষয়ে ফায়সালা দেওয়া ও নেওয়ার সময় আগে কুরআন ও পরে সুন্নাহ নয়। বরং পাশাপাশি উভয়ই উম্মাহর জন্য আলোক-দিশারী।

যেমন মনে করুন, এক শিক্ষিত ব্যক্তির জীবন পরিচালিত হল কুরআন দ্বারা। সে হাদীস জানে ও মানে; কিন্তু কুরআনের ফায়সালা পেয়ে গেলে আর হাদীস দেখে না। হঠাৎ একদিন সকালে দেখল, তার পুকুরে বড় একটি মাছ মারা পড়েছে। এখন সেটা খাওয়া হালাল না হারাম তা দেখার জন্য কুরআন খুলল। দেখল কুরআনের এক জায়গায় লিখা আছে,

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ﴾

অর্থাৎ, তিনি শুধু তোমাদের জন্য মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যা আল্লাহ ব্যতীত অপরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত - তাই অবৈধ করেছেন। *(সূরা বাক্বারাহ ১৭৩ আয়াত)*

আরো এক জায়গায় উল্লেখ আছে,

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ ﴾ (المائدة ٣)

অর্থাৎ, তোমাদের জন্য মৃত, রক্ত, শূকর মাংস---- হারাম করা হয়েছে।

অমুক (কাজের) মহিলাদেরকে অভিশাপ করেছেন।' তিনি বললেন, 'যাদেরকে আল্লাহর রসূল ﷺ অভিশাপ করেছেন এবং যার উল্লেখ আল্লাহর কিতাবে রয়েছে তাদেরকে অভিশাপ করতে আমার বাধা কিসের?' উম্মে ইয়াকূব বলল, 'আমি (কুরআন মাজীদের) আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি, কিন্তু আপনি যে কথা বলছেন তা তো কোথাও পাইনি।' ইবনে মসউদ ؓ বললেন, 'তুমি যদি (গভীরভাবে) পড়তে তাহলে অবশ্যই সে কথা পেয়ে যেতে। তুমি কি এ আয়াত পড়নি?'

﴿ ﴾

অর্থাৎ, রসূল তোমাদেরকে যা(র নির্দেশ) দেয় তা গ্রহণ (ও পালন) কর এবং যা নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক।" *(সূরা হাশ্‌র ৭ আয়াত)*

উম্মে ইয়াকূব বলল, 'অবশ্যই পড়েছি।' ইবনে মসউদ ؓ বললেন, 'তাহলে শোন, তিনি ঐ কাজ করতে নিষেধ করেছেন।' মহিলাটি বলল, 'কিন্তু আপনার পরিবারকে তো ঐ কাজ করতে দেখেছি।' ইবনে মসউদ ؓ বললেন, 'আচ্ছা তুমি গিয়ে দেখ তো।'

মহিলাটি তাঁর বাড়ি গিয়ে নিজ দাবী অনুযায়ী কিছুই দেখতে পেল না। পরিশেষে ইবনে মসউদ ؓ তাকে বললেন, 'যদি তাই হত তাহলে আমি তার সহিত সঙ্গমই করতাম না।' *(বুখারী ৪৮৮৬নং, মুসলিম ২১২৫নং, আসহাবে সুনান)*

আব্দুর রহমান বিন ইয়াযিদ একটি লোককে দেখলেন, সে (হজ্জ বা উমরার) ইহরাম বেঁধেছে; কিন্তু তার পরিহিত সাধারণ কাপড়ও তার গায়ে আছে। তা দেখে তিনি তাকে ঐ কাপড় খুলে ফেলতে বললেন। লোকটি বলল, আপনি ঐ কাপড় খুলতে আদেশকারী কুরআনের একটি আয়াত আমার কাছে পেশ করুন। তিনি তার জবাবে পাঠ করলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, রসূল তোমাদেরকে যা(র নির্দেশ) দেয় তা গ্রহণ (ও পালন) কর এবং যা নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক।" *(সূরা হাশ্‌র ৭ আয়াত, আল-মুয়াফাকাত*

(সূরা মাইদাহ ৩ আয়াত)

বলা বাহুল্য, এই বিধান পেয়ে সে বেচারী আর ঐ মাছটি তুলে রান্না করে না খেয়ে ফেলেই দিল। অথচ সে যদি সুন্নাহকেও পাশাপাশি জীবন-সংবিধান বলে রেখে নিত, তাহলে অবশ্যই মৃত বড় ঐ রুই মাছটি থেকে বঞ্চিত হত না।

কুরআনে যে সব মহিলাকে বিবাহ করা হারাম তার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়ার পর বলা হয়েছে,

﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ ﴾ (النساء ٢٤)

অর্থাৎ, এ ছাড়া অন্যান্য মহিলা তোমাদের জন্য (বিবাহ) হালাল করা হয়েছে----। *(সূরা নিসা ২৪ আয়াত)*

এবারে কেউ যদি সেই সাথে সুন্নাহ না দেখে নিজ স্ত্রীর বর্তমানে তার খালা অথবা ফুফুকেও বিবাহ করতে চায়, তাহলে সে অবশ্যই হারাম বিবাহ করে বসবে। কারণ, সুন্নাহতে এমন বিবাহ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

সুন্নাহ বা হাদীসকে মেনে নেওয়ার জন্য মহান আল্লাহর এই বাণীই আমাদেরকে তাকীদ করে, আর তা মেনে নেওয়া আমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, রসূল তোমাদেরকে যা(র নির্দেশ) দেয় তা গ্রহণ (ও পালন) কর এবং যা নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক।" *(সূরা হাশ্‌র ৭ আয়াত)*

হযরত ইবনে মসউদ ؓ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলতেন, '(হাত বা চেহারায়) দেগে যারা নকশা করে দেয় অথবা করায়, চেহারা থেকে যারা লোম তুলে ফেলে (ভ্রূ চাঁছে), সৌন্দর্য আনার জন্য যারা দাঁতের মাঝে ঘসে (ফাঁক ফাঁক করে) এবং আল্লাহর সৃষ্টি-প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটায় (যাতে তাঁর অনুমতি নেই) এমন সকল মহিলাদেরকে আল্লাহ অভিশাপ করুন।'

বনী আসাদ গোত্রের এক উম্মে ইয়াকূব নামক মহিলার নিকট এ খবর পৌঁছলে সে এসে ইবনে মাসউদ ؓ কে বলল, 'আমি শুনলাম, আপনি অমুক

৪/২৫, জামেউ বায়ানিল ইলম ২/ ১৮৯)

তদনুরূপ সুন্নাহ কুরআনে বর্ণিত নির্দেশের অতিরিক্ত ভিন্ন নির্দেশ দিতে পারে যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

)

(

অর্থাৎ, যখন তোমরা ভূপৃষ্ঠে সফর কর, তখন তোমরা নামায সংক্ষেপ করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই; যদি তোমরা এই আশংকা কর যে, কাফেররা তোমাদেরকে বিব্রত করবে। *(সূরা নিসা ১০১ আয়াত)*

বাহ্যতঃ উক্ত আয়াত থেকে যদিও এই কথা বুঝা যায় যে, কেবল ভয়ের সময় নামায কসর করা বৈধ, তবুও ভয় ছাড়া নিরাপদ সময়েও কসর করা যায়। মহানবী ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম ﷺ-গণকে ভয়-অভয় উভয় অবস্থাতেই কসর করতে নির্দেশ দিয়েছেন বলে প্রমাণিত।

একদা হযরত য়্যা'লা বিন উমাইয়া ﷺ হযরত উমার ﷺ-কে বলেন, কি ব্যাপার যে, লোকেরা এখনো পর্যন্ত নামায কসর পড়েই যাচ্ছে, অথচ মহান আল্লাহ তো কেবল বলেছেন যে, "যখন তোমরা ভূপৃষ্ঠে সফর কর, তখন তোমরা নামায সংক্ষেপ করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই; যদি তোমরা এই আশংকা কর যে, কাফেররা তোমাদেরকে বিব্রত করবে।" আর বর্তমানে তো ভীতির সে অবস্থা অবশিষ্ট নেই?

হযরত উমার ﷺ উত্তরে বললেন, যে ব্যাপারে তুমি আশ্চর্যবোধ করছ, আমিও সেই ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করে নবী ﷺ-এর নিকট এ কথার উল্লেখ করলে তিনি বললেন, "এটা তোমাদেরকে দেওয়া আল্লাহর একটি সদকাহ। সুতরাং তোমরা তাঁর সদকাহ গ্রহণ কর।" *(আহমাদ, মুসলিম, মিশকাত ১৩৩৫নং)*

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ ﴾ (البقرة ١٨٠)

অর্থাৎ, যখন তোমাদের কারো মৃত্যু নিকটবর্তী বলে মনে হয়, তখন সে যদি ধন-সম্পত্তি ছেড়ে যায় তাহলে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য বৈধভাবে অসিয়ত করা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হল; ধর্মভীরুদের এটা অবশ্যকরণীয়। *(সূরা বাক্বারাহ ১৮০ আয়াত)*

মহানবী ﷺ অতিরিক্ত নির্দেশ দিয়ে বলেন, "আল্লাহ প্রত্যেক হকদারকে নিজ হক দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং কোন ওয়ারেসের জন্য অসিয়ত নেই।" *(আহমাদ, আবু দাউদ ২৮৭০নং, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ চোরের হাত কেটে নিয়ে শাস্তি দিতে আদেশ করেছেন, কিন্তু বাজু থেকে নিয়ে আঙ্গুলের ডগা পর্যন্ত হাতের ভিতরে কতটুকু অংশ কাটতে হবে সে কথা বলেননি। মহানবী ﷺ-এর সুন্নাহতে আমরা সে কথা জানতে পারি যে, কব্জি পর্যন্ত হাত কাটতে হবে। যেমন কত পরিমাণ মাল চুরি করলে হাত কাটা যাবে কুরআনে তারও উল্লেখ নেই। আমরা তা হাদীস থেকে জানতে পারি যে, এ চতুর্থাংশ অথবা তার বেশী পরিমাণ দীনার চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে। *(বুখারী, মুসলিম ১৬৮৪নং)*

মহান আল্লাহর নির্দেশমতে সুন্দর বেশভূষা আমাদের জন্য হালাল। তিনি বলেন,

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِىَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ ﴾ (الأعراف ٣٢)

অর্থাৎ, "বল, বান্দাদের জন্য আল্লাহর সৃষ্ট সৌন্দর্য এবং উত্তম জীবিকা কে হারাম (নিষিদ্ধ) করেছে? বল, পার্থিব জীবনে বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে এ সমস্ত তাদের জন্য, যারা ঈমান এনেছে।" *(সূরা আ'রাফ ৩২ আয়াত)*

কিন্তু মহানবী ﷺ-এর নির্দেশ অনুযায়ী পুরুষের জন্য রেশম ও সোনার জিনিস ব্যবহার হারাম করা হয়েছে। *(তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৩১৩৭নং)*

(৩) সুন্নাহ হল হিকমত (প্রজ্ঞা)।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾ ﴾ ( )

অর্থাৎ, তিনিই নিরক্ষরদের মধ্যে তাদের একজনকে পাঠিয়েছেন রাসূলরূপে, যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত; ইতিপূর্বে তো তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে। *(সূরা জুমআহ ২ আয়াত)*

(৪) যে কোন আমল কবুল হওয়ার মৌলিক দুটি শর্ত রয়েছে। সে শর্ত দুটি পূরণ হওয়া ছাড়া কোন আমল ও ইবাদত মহান আল্লাহ গ্রহণ করেন না। সে শর্ত দুটি পালন হওয়া ছাড়া কোন আমল বা কর্ম নেক বা সৎ হতে পারে না। সে দুটির একটি না থাকলে যে কোনও আমল পন্ড, নিষ্ফল ও বেকার হতে বাধ্য। আর সে দুটি শর্ত হল, ইখলাস ও সুন্নাহর তরীকা।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَـٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا ﴿١١٠﴾ ﴾ ( )

অর্থাৎ, সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে। *(সূরা কাহফ ১১০ আয়াত)*

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓا۟ أَعْمَـٰلَكُمْ ﴿٣٣﴾ ﴾

অর্থাৎ, হে মুমিনরা! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও রসূলের আনুগত্য কর। আর তোমাদের কর্মসমূহকে বিনষ্ট করো না। *(সূরা মুহাম্মাদ ৩৩ আয়াত)*

বলা বাহুল্য, এ কথা বিদিত যে, হাদীসের অনুসরণ ছাড়া রসূল ﷺ-এর আনুগত্য সম্ভব নয়।

(৫) সুন্নাহ ছাড়া যে আমল ও ইবাদত হয়, তা বিদআত হয়, সুন্নাহর

তরীকার বাইরে যে আমল হয়, তা প্রত্যাখ্যাত হয়।

মা আয়েশা رضي الله عنها প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসুল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনবিষয়ে অভিনব কিছু রচনা করবে যা এর অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত।" *(বুখারী ২৬৯৭, মুসলিম ১৭১৮নং)*

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি এমন কোন কর্ম করে যাতে আমাদের কোন নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত।" *(মুসলিম ১৭১৮ নং)*

(৬) সুন্নাহ ছাড়া আমল হল বিদআত, বিদআত হল ভ্রষ্টতা। আর ভ্রষ্টতা হল জাহান্নামের পথ।

সাহাবী ইরবায বিন সারিয়াহ ﵁ বলেন, (একদা) আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে এমন উচ্চাঙ্গের উপদেশ দান করলেন যাতে আমাদের চিত্ত কম্পিত এবং চক্ষু অশ্রু বহমান হল। আমরা বল্লাম, হে আল্লাহর রসূল! এটা যেন বিদায়ী উপদেশ, অতএব আমাদেরকে কিছু অসিয়ত (অতিরিক্ত নির্দেশ দান) করুন। তিনি বলেন, "তোমাদের আল্লাহর ভীতি এবং (পাপ ছাড়া অন্য বিষয়ে) আমীর (বা নেতা) এর আনুগত্য স্বীকার করার অসিয়ত করছি! যদিও বা তোমাদের আমীর এক জন ক্রীতদাস হয়। এবং অবশ্যই তোমাদের মধ্যে যারা আমার বিদায়ের পর জীবিত থাকবে তারা অনেক রকমের মতভেদ দেখতে পাবে। অতত্রব তোমরা আমার এবং আমার সুপথ প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ অবলম্বন করো, তা দন্ত দ্বারা দৃঢ়তার সহিত ধারণ করো। (তাতে যা পাও মান্য কর এবং অন্য কোনও মতের দিকে আকৃষ্ট হয়ো না।) এবং (দ্বীনে) নবরচিত কর্মসমূহ হতে সাবধান! কারণ, নিশ্চয়ই প্রত্যেক বিদআহ (নতুন আমল) ভ্রষ্টতা।" *(আবু দাউদ ৪৪৪৩, তিরমিযী ২৮১৫, ইবনে মাজাহ ৪২ নং)*

নাসাঈর এক বর্ণনায় আছে, "আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতাই হল জাহান্নামের পথ।" *(সুনান নাসাঈ ১/৫৫৫, ইবনে খুযাইমা ৩/ ১৪৩)*

(৭) সুন্নাহ হল নাজাতের অসীলা, বাঁচার পথ, নূহের কিশ্তী। যে ব্যক্তি হাদীস মেনে চলবে, সে পথভ্রষ্টতা থেকে বেঁচে যাবে। বেঁচে যাবে আল্লাহর গযব থেকে এবং

আখেরাতের আযাব থেকে। এ ব্যাপারে নিম্নের হাদীসগুলি প্রণিধানযোগ্য ঃ-

হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, বিদায়ী হজ্জে আল্লাহর রসূল ﷺ লোকেদের মাঝে খোতবা (ভাষণ) দিলেন। তাতে তিনি বললেন, "শয়তান এ বিষয়ে নিরাশ হয়ে গেছে যে, তোমাদের এই মাটিতে তার উপাসনা হবে। কিন্তু এতদ্ব্যতীত তোমরা যে সমস্ত কর্মসমূহকে অবজ্ঞা কর তাতে তার আনুগত্য করা হবে- এ নিয়ে সে সন্তুষ্ট। সুতরাং তোমরা সতর্ক থেকো! অবশ্যই আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি; যদি তা দৃঢ়তার সহিত ধারণ করে থাকো তবে কখনই তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না; আর তা হল আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবীর সুন্নাহ (কুরআন ও হাদীস)" *(হাকেম, সহীহ তারগীব ৩৬নং)*

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, "এই কুরআন (কিয়ামতে) সুপারিশকারী; এর সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে। যে ব্যক্তি এর অনুসরণ করবে সে তাকে জান্নাতের প্রতি পথপ্রদর্শন করে নিয়ে যাবে। আর যে তাকে বর্জন করবে অথবা তার থেকে বিমুখ হবে তাকে ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" *(বায়যার হাদীসটিকে মওকূফ; সাহাবীর নিজস্ব উক্তি রূপে বর্ণনা করেছেন। সহীহ তারগীব ৩৯ নং। অবশ্য তিনি জাবের ﷺ কর্তৃক উক্ত হাদীসটিকেই মরফূ' (রসূল ﷺ এর উক্তি) রূপে বর্ণনা করেছেন। সহীহ তারগীব ৪০নং)*

হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আমার প্রত্যেকটি উম্মত বেহেশ্তে প্রবেশ করবে, তবে সে নয় যে (বেহেশ্ত্ প্রবেশে) অস্বীকার করবে।" বলা হল, 'অস্বীকার আবার কে করবে হে আল্লাহর রসূল?!' তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে, সে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে। আর যে আমার নাফরমানি করবে, সেই আসলে (বেহেশ্ত্ প্রবেশে) অস্বীকার করবে।" *(বুখারী ৭২৮০নং)*

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "প্রত্যেক কর্মের উদ্যম আছে এবং প্রত্যেক উদ্যমের আছে নিরুদ্যমতা। সুতরাং যার নিরুদ্যমতা আমার সুন্নাহর গন্ডির ভিতরেই থাকে সে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয় এবং যার নিরুদ্যমতা এ ছাড়া অন্য কিছুতে (সুন্নত বর্জনে)

অতিক্রম করে সে ধ্বংস হয়ে যায়।" *(ইবনে আবী আসেম, ইবনে হিব্বান, আহমদ, ত্বাহাবী, সহীহ তারগীব ৫৩ নং)*

হযরত আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সে ব্যক্তি আমার সুন্নত (তরীকা) হতে বিমুখতা প্রকাশ করে সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়।" *(বুখারী ৫০৬৩, মুসলিম ১৪০১নং)*

হযরত ইরবায বিন সারিয়াহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছেন, তিনি বলেছেন যে, "অবশ্যই তোমাদেরকে উজ্জ্বল (স্পষ্ট দ্বীন ও হুজ্জতের) উপর ছেড়ে যাচ্ছি; যার রাত্রিও দিনের মতই। ধ্বংসোন্মুখ ছাড়া তা হতে অন্য কেউ ভিন্নপথ অবলম্বন করবে না।" *(ইবনে আবী আসেম, আহমদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহ তারগীব ৫৬নং)*

ইমাম মালেক (রঃ) বলেন, 'সুন্নাহ হল নূহের কিশ্তীর মত। যে তাতে সওয়ার হবে, সে মুক্তি পাবে এবং যে তা হতে পিছনে থেকে যাবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে।' *(মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ ৪/ ১৩৭)*

(৮) রসূলের ফায়সালার সামনে মুমিনের আর কোন এখতিয়ার থাকে না। মন না মানলেও তাঁর আদেশ পালন ব্যতীত মুসলিমের আর কোন উপায় থাকে না।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾ ﴾ (   )

অর্থাৎ, আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন ঈমানদার পুরুষ কিংবা নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। আর কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে। *(সূরা আহযাব ৩৬ আয়াত)*

যায়েদ যেহেতু (স্বাধীনকৃত) গোলাম ছিলেন সেহেতু তাঁকে স্বামীরূপে বরণ করতে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট জয়নাব ইতস্ততঃ প্রকাশ করলে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। *(ইবনে কাসীর প্রমুখ)*

(৯) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের হুকুম এসে গেলে তা পালন করা ব্যতীত, সে আদেশ মান্য করা ব্যতীত মুমিনের অন্য কোন এখতিয়ার থাকে না। যে যাই বলুক, তখন সকল মত ত্যাগ করে তাঁর মতই অবলম্বন করা জরুরী হয়। যে যাই বলুক, সহীহ হাদীস সামনে এলে তা বর্জন করা, তা এড়িয়ে চলার, তা অবজ্ঞা করার কোন উপায় থাকে না। তখন মুমিন 'শুনলাম ও মেনে নিলাম' বলা ছাড়া আর অন্য কোন পথ থাকে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ (النور ٥١)

অর্থাৎ, যখন মুমিনদের আপোসের কোন বিষয়ের ফায়সালার জন্য তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে আহবান করা হয়, তখন তারা তো কেবল এ কথাই বলে, 'আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম।' আর ওরাই সফলকাম। *(সূরা নূর ৫১ আয়াত)*

(১০) যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করল, সে আসলে মহান আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি সহীহ হাদীসের বিরোধিতা করল, সে আসলে আল্লাহরই বিরোধিতা করল। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾

অর্থাৎ, যে রাসূলের আনুগত্য করে, সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করে। আর যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের উপর প্রহরীরূপে আমি তোমাকে প্রেরণ করিনি। *(সূরা নিসা ৮০ আয়াত)*

(১১) মুমিনের জীবনের আদর্শ হলেন রসূল। তার প্রতি পদক্ষেপের পথপ্রদর্শক হল, সহীহ হাদীস। অন্ধকার পথের আলোক দিশারী হল মুহাম্মাদী আদর্শ। মানুষের সাংসারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবন গড়ার নমুনা হল, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ। সার্থক জীবন তৈরীর ছাঁচই হল, নবী মুহাম্মাদ ﷺ। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴾ ( )

অর্থাৎ, তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, (তোমাদের মধ্যে) যে আল্লাহ ও পরকালে আশা (বিশ্বাস বা ভয়) রাখে এবং অধিকাধিক আল্লাহকে স্মরণ করে। *(সূরা আহযাব ২১ আয়াত)*

(১২) মহানবী ﷺ-কে যে নিজের পথপ্রদর্শক ও রাহবার মানবে, সহীহ হাদীসকে যে পথের দিশারী মেনে নেবে, সে পথ পাবে। বিভিন্ন ভ্রান্ত পথের কুহক থেকে মুক্তি পাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَۖ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْۖ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْۚ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴾

অর্থাৎ, বল, আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী; তোমরা তার আনুগত্য করলে সৎপথ পাবে। রাসূলের কাজ তো কেবল স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া। *(সূরা নূর ৫৪ আয়াত)*

(১৩) যে রসূল ﷺ-কে নিজের পথপ্রদর্শক বলে মানবে না এবং কুরআন ও হাদীসের বিরোধিতা করবে, জানা সত্ত্বেও তাঁর নির্দেশের অন্যথা করবে এবং তাঁর আদেশ লংঘন করবে, সে ব্যক্তি ফিতনাগ্রস্ত হবে অথবা তার উপর কঠিন আযাব বা গযব নাযিল হবে। এ দুনিয়ায় না হলেও আখেরাতে সে আযাব ভোগ করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

অর্থাৎ, সুতরাং যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে,

বিপর্যয় (ফিতনা) অথবা কঠিন শাস্তি (আযাব) তাদেরকে গ্রাস করবে। *(সূরা নূর ৬৩ আয়াত)*

সুন্নাহর খিলাপ কোন আমল করলেই সলফগণও সেই কথা বুঝতেন। অনেক ভালো মনে করে করা (ভালো) আমলও (যেমন ঃ নামায, রোযা, দুআ, দরূদ, প্রভৃতি) যদি সুন্নাহর বিপরীত হয়, তাহলে তাতেও সওয়াবের জায়গায় আযাবই হবে প্রাপ্য।

ত্বাউস আসরের পর ২ রাকআত নামায পড়তেন। একদা ইবনে আব্বাস তাঁকে ঐ নামায পড়তে নিষেধ করলেন। ত্বাউস বললেন, ঐ নামায তো সুন্নত মনে করে পড়া নিষিদ্ধ। ইবনে আব্বাস বললেন, আল্লাহর রসূল ﷺ আসরের পর নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। সুতরাং জানি না যে, তুমি ঐ নামায পড়ে আযাব পাবে না সওয়াব? যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـٰلًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾ ﴾ (   )

অর্থাৎ, আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন ঈমানদার পুরুষ কিংবা নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। আর কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে। *(সূরা আহযাব ৩৬ আয়াত, আল-মুয়াফাক্বাত ৪/২৫)*

একদা ইবনুল মুসাইয়িব ফজরের নামাযের পর একটি লোককে বেশী বেশী নামায পড়তে দেখে তাকে নিষেধ করলেন। লোকটি বলল, হে আবূ মুহাম্মাদ! নামায পড়লেও কি আল্লাহ আমাকে আযাব দেবেন? তিনি বললেন, না, (নামাযের জন্য নয়); বরং সুন্নাহর খিলাপ করার জন্য। *(তামহীদ, ইবনে আব্দুল বার্র ২০/১০৪)*

(১৪) যে রসূল ও তাঁর সাহাবীদের বিরোধী মতে চলবে, কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর বিপরীত পথ অবলম্বন করবে, তার পথ আসলে দোযখের পথ। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾ ﴾ (   )

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ভিন্ন অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে সে যে দিকে ফিরে যায় সে দিকেই তাকে ফিরিয়ে দেব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব। আর তা কত মন্দ আবাস! *(সূরা নিসা ১১৫ আয়াত)*

(১৫) রসূলের কথার উপর হওয়া, তাঁর কথার উপর কথা দেওয়া, তাঁর উপর নিজ কণ্ঠস্বর উঁচু করা, সহীহ হাদীস বিরোধী কথা বলা, সহীহ হাদীসের উপরে অন্য কারো মত বা রায়কে প্রাধান্য দেওয়া মুমিনের আমল ধ্বংস হওয়ার কারণ। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَرْفَعُوٓا۟ أَصْوَٰتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِىِّ وَلَا تَجْهَرُوا۟ لَهُۥ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَـٰلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَٰتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٣﴾ ﴾ (-   )

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সামনে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল, তার সাথে সেইভাবে উচ্চস্বরে কথা বলো না। কারণ তাতে তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের আমল পন্ড হয়ে যাবে। যারা আল্লাহর রসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা

ও মহাপুরস্কার। *(সূরা হুজুরাত ১-৩ আয়াত)*

ইমাম ইবনুল কাইয়েম বলেন, মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তারা নিজেরা যেমন আপোসে উচ্চস্বরে কথা বলে, তেমনি উচ্চস্বরে রাসূল ﷺ-এর জন্য বললে তাদের আমল ধ্বংস হয়ে যাবে। অবশ্য তাতে কেউ মুর্তাদ্দ হয়ে যাবে না; বরং তা এমন পাপ হবে, যাতে পাপীর আমল ধ্বংস হয়ে যাবে, অথচ সে তা বুঝতে পারবে না।

বলা বাহুল্য, সেই ব্যক্তি সম্পর্কে কি ধারণা হতে পারে, যে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর উক্তির উপর অথবা পথনির্দেশ ও তরীকার উপর অন্য কারো উক্তি, পথনির্দেশ বা তরীকাকে প্রাধান্য দেয়?

এই ব্যক্তিও কি সেই ব্যক্তি নয়, যার অজ্ঞাতসারে তার আমল ধ্বংস হয়ে যায়? *(আল-ওয়াবিলুস স্বাইয়িব ২৪পৃঃ)*

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, মুর্তাদ্দ হওয়া ছাড়া আমল পন্ড বা নিস্ফল হয় কি করে? তাহলে তার উত্তর এই যে, কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবাদের উক্তি থেকে এ কথা প্রমাণিত যে, পাপকর্ম পুণ্যকর্মকে নিস্ফল করে ফেলে; যেমন পুণ্যকর্ম পাপকর্মকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبۡطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلۡمَنِّ وَٱلۡأَذَىٰ ﴾ (   )

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা কৃপা প্রকাশ ও ক্লেশ দান করে নিজেদের দানগুলো ব্যর্থ করে ফেলো না। *(সূরা বাক্বারাহ ২৬৪ আয়াত)*

সাহাবী যায়দ বিন আরকাম যখন 'ঈনাহ' [1] ব্যবসা করেন, তখন আয়েশা (রাঃ) তাঁর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'যায়দকে বলে দাও যে, তওবা না করলে সে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে কৃত জিহাদকে নষ্ট করে ফেলেছে।'

এ ব্যাপারে ইমাম আহমাদও স্পষ্ট উক্তি ব্যক্ত করে বলেছেন, 'বর্তমান যুগে

( ) *কোন জিনিস নির্দিষ্ট মেয়াদ দিয়ে ধারে বিক্রয় করে, অতঃপর সেই জিনিসকেই নগদে তার থেকে কম দামে ক্রয় করার ব্যবসা।*

বান্দার উচিত ঋণ করে বিবাহ করা। যাতে সে এমন জিনিসের দিকে দৃষ্টিপাত না করে ফেলে, যা তার জন্য হালাল নয় এবং তার ফলে তার আমল ধ্বংস হয়ে যায়।' *(কিতাবুস স্বালাত, ইবনুল কাইয়েম ৬৫পৃঃ)*

(১৬) রসূলের পথ যে অবলম্বন করবে না, তাকে একদিন পস্তাতে হবে, যেদিন হাজার পস্তানি কোন কাজে দেবে না। যে রসূল ﷺ-কে ছেড়ে অন্যকে নিজের বন্ধু মনে করে, অন্যকে নিজের আদর্শ মনে করে, অন্যকে নিজের পথপ্রদর্শক মনে করে, রসূলের মত ব্যতিরেকে অন্যের মতকে প্রাধান্য দেয়, সে কিয়ামতের দিন পস্তাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَيَوۡمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيۡهِ يَقُولُ يَٰلَيۡتَنِي ٱتَّخَذۡتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلٗا ۝٢٧ يَٰوَيۡلَتَىٰ لَيۡتَنِي لَمۡ أَتَّخِذۡ فُلَانًا خَلِيلٗا ۝٢٨ لَّقَدۡ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكۡرِ بَعۡدَ إِذۡ جَآءَنِيۗ وَكَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ لِلۡإِنسَٰنِ خَذُولٗا ۝٢٩ ﴾ (-   )

অর্থাৎ, সেদিন অত্যাচারী নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, 'হায়! আমি যদি রসূলের সাথে পথ অবলম্বন করতাম! হায়! দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! আমার নিকট উপদেশ আসার পর সে আমাকে তা থেকে বিভ্রান্ত করেছিল। আর শয়তান মানুষকে বিপদকালে ধোকা দেয়।' *(সূরা ফুরকান ২৭-২৯ আয়াত)*

(১৭) যে রসূল ﷺ-এর অনুসরণ করবে, যে সহীহ হাদীসের পথ অনুসরণ করবে, সে মহান আল্লাহর ভালোবাসা ও ক্ষমা লাভ করবে।

﴿ قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ۝٣١ ﴾ (   )

অর্থাৎ, বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমার অনুসরণ কর, তাহলেই আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। *(সূরা আলে ইমরান ৩১ আয়াত)*

(১৮) যে আল্লাহর নবী ﷺ-কে বিচারক মানবে না, প্রত্যেক মতবিরোধের সময় ফায়সালাকারী মানবে না, সহীহ হাদীসকে শেষ ফায়সালাকারী বলে স্বীকার করবে না, নির্দ্বিধায় সেই হাদীসের ফায়সালাকে গ্রহণ করবে না, সে মুমিন বা ঈমানদার হতে পারবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (   )

অর্থাৎ, কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার-ভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে না নেয়। *(সূরা নিসা ৬৫ আয়াত)*

(১৯) কিতাব ও সুন্নাহ হল সকল সমস্যার সমাধানদাতা। সর্ব জীবনের বিধান ও সংবিধান। আপোসের তর্ক-বিবাদ ও ঝামেলার শেষ ফায়সালা কুরআন ও সহীহ হাদীস। কিতাব ও সুন্নাহতেই বিচার খুঁজতে হবে এবং সেই বিচার মানতেও হবে। এটাই হল ঈমানের দাবী। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ (   )

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি (রাষ্ট্রনেতা ও উলামাদের) আনুগত্য কর। আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মতভেদ ঘটে তবে সে বিষয় তোমরা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি ফিরিয়ে দাও। এটিই তো উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর। *(সূরা নিসা ৫৯ আয়াত)*

(২০) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করলে আমরা আল্লাহর কাছে দয়ার

পাত্র হব। আল্লাহ আমাদের উপর রহম করবেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (   )

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য কর। যাতে তোমরা কৃপালাভ করতে পার। *(সূরা আ-লে ইমরান ১৩২ আয়াত)*

(২১) সহীহ হাদীস যখন আহবান করবে, তখন সকলকে সেই আহবানে সাড়া দেওয়া জরুরী। আর কারো প্রতি মায়া-মহব্বত না রেখে কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মহব্বত রাখা ঈমানী কর্তব্য। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! রসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহবান করে যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে তখন আল্লাহ ও রসূলের আহবানে সাড়া দাও। *(সূরা আনফাল ২৪ আয়াত)*

রসূল ﷺ-এর আহবানে সাড়া দেওয়ার এত বড় গুরুত্ব রয়েছে যে, নামায অবস্থায় থাকলেও সে গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে। নামায অবস্থাতেও তাঁর ডাকে সাড়া দিতে হবে। আবু সাঈদ বিন মুআল্লা ؓ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি মসজিদে নামায পড়ছিলাম। এমতাবস্থায় নবী ﷺ আমাকে ডাকলেন। আমি সাড়া দিলাম না। অতঃপর নামায শেষ করে তাঁর নিকট এসে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি নামায পড়ছিলাম।' তিনি বললেন, "আল্লাহ কি বলেননি যে, তোমরা আল্লাহ ও রসূলের আহ্বানে সাড়া দাও যখন তোমাদেরকে (রসূল) ডাকে---?' *(সূরা আনফাল ২৪ আয়াত, বুখারী ৫০০৬ নং)*

আজ আর তিনি আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তাঁর ছেড়ে যাওয়া আহবান রয়েছে। সহীহ হাদীসে বর্ণিত তাঁর সেই আহবানে সাড়া দেওয়া আমাদের সকলের জন্য জরুরী।

(২২) প্রকৃত ঈমানদার হল সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে

এই বন্ধুর একটি উপমা আছে, অতএব তোমরা সেটি বর্ণনা কর।' তখন তাঁদের কেউ বললেন, 'তিনি তো ঘুমিয়ে আছেন।' তাঁদের কেউ বললেন, 'তাঁর চোখে ঘুম থাকলেও তাঁর অন্তর জাগ্রত।' তখন তাঁরা বললেন, 'তাঁর উপমা হল; এক ব্যক্তি একটি গৃহ নির্মাণ করে খাবারের দস্তরখান প্রস্তুত করে লোকদেরকে দাওয়াত দিয়ে আনার জন্য একজন আহবায়ককে প্রেরণ করল। অতঃপর যে ঐ আহবায়কের আহবানে সাড়া দিল, সে ঐ গৃহে প্রবেশ করে সেখানে রাখা খাবার খেতে পেল। আর যে আহবায়কের আহবানে সাড়া দিল না, সে ঐ গৃহে প্রবেশ করে সেখানে রাখা খাবার খেতে পেল না।'

অতঃপর তাঁরা আপোসে বললেন, 'তোমরা এই উপমার তাৎপর্য বলে দাও, যাতে তিনি বুঝতে পারেন।' এবারও তাঁদের কেউ বললেন, 'তিনি তো ঘুমিয়ে আছেন।' তাঁদের কেউ বললেন, 'তাঁর চোখে ঘুম থাকলেও তাঁর অন্তর জাগ্রত।' তখন তাঁরা বললেন, 'ঐ গৃহ হল জান্নাত। ঐ আহবায়ক হলেন মুহাম্মাদ। সুতরাং যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের আনুগত্য করবে, সে আসলে আল্লাহর আনুগত্য করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের নাফরমানি করবে, সে আসলে আল্লাহরই নাফরমানি করবে। আর মুহাম্মদ হলেন মানুষের (মুমিন ও কাফেরের) মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণকারী (মানদন্ড)। *(বুখারী, মিশকাত ১৪৪নং)*

সুন্নাহর অনুসরণের ব্যাপারে তিনি নিজের উপমা নিজেও বর্ণনা করেছেন। আবূ মূসা আশআরী ﵁ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আমার এবং যে জিনিস দিয়ে আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন তার উদাহরণ হল এই যে, এক ব্যক্তি নিজ সম্প্রদায়ের নিকট এসে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি আমার এই দু' চোখে একদল শত্রুসৈন্য দেখে আসছি এবং আমি হচ্ছি তোমাদের জন্য একজন স্পষ্ট সতর্ককারী। সুতরাং তোমরা (বাঁচার জন্য) তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি কর।' এ কথা শুনে তার সম্প্রদায়ের কিছু লোক তার কথা মেনে নিয়ে রাতারাতি পলায়ন করল এবং এতে তারা ধীরে-সুস্থে যেতে পারল, আর (শত্রুর কবল থেকে) মুক্তিও পেল। পক্ষান্তরে অন্য একদল লোক তার সেই কথাকে মিথ্যা মনে করল। ফলে তারা নিজ নিজ ঘরে রাত্রিবাস করল। কিন্তু ভোর হতেই শত্রুসৈন্য তাদের উপর

থাকলে তাঁর বিনা অনুমতিতে কোথাও যেতে পারে না। তাঁর অনুমতি ছাড়া কোন পৃথক মত সে অবলম্বন করতে পারে না। তাঁর বিনা অনুমতিতে অন্য কারো মত গ্রহণ করতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَإِذَا كَانُوا۟ مَعَهُۥ عَلَىٰٓ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا۟ حَتَّىٰ يَسْتَـْٔذِنُوهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَـْٔذِنُونَكَ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ فَإِذَا ٱسْتَـْٔذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾ ﴾ (   )

অর্থাৎ, তারাই হল প্রকৃত মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখে এবং রসূলের সঙ্গে সমষ্টিগত ব্যাপারে একত্রিত হলে তার অনুমতি ব্যতীত সরে পড়ে না। যারা তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে তারাই আসলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখে। সুতরাং তারা তাদের কোন ব্যক্তিগত কাজে বাইরে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তাদেরকে তুমি অনুমতি দাও এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা নূর ৬২ আয়াত)*

প্রকৃত আদব হল এটাই যে, নেতার অনুমতি ছাড়া আমরা অন্যথা কোথাও যাব না। আর যারা আদবের এ রীতি মান্য করে না, তারা বেআদব বৈ কি?

মহানবী ﷺ-এর অনুসরণের উপমা

মহান আল্লাহ মহানবী ﷺ-এর উদাহরণ বর্ণনা করে তাঁকে উজ্জ্বল প্রদীপ বলে আখ্যায়িত করেছেন। *(সূরা আহযাব ৪৬ আয়াত)* তাঁর সেই আলোকে ঘোর অন্ধকারে দিশাহারা মানুষ পথের দিশা পেয়েছে।

মহানবী ﷺ-এর উপমা বর্ণনা করেছেন ফিরিশ্তাগণ। জাবের ﵁ বলেন, একদিন একদল ফিরিশ্তা নবী ﷺ-এর নিকট এসে উপস্থিত হলেন। নবী ﷺ তখন ঘুমাচ্ছিলেন। ফিরিশ্তাগণ একে অপরকে বলতে লাগলেন, 'তোমাদের

মৃত সুন্নত জীবিত করার মাহাত্ম্য

সুন্নতের উপর আমল করুন। যে সুন্নত মানুষের মাঝে মারা পড়েছে, যে সুন্নতের উপর কেউ আমল করে না, যে সুন্নতের প্রতি মানুষের অবজ্ঞা রয়েছে, সেই সুন্নতকে হিকমতের সাথে সমাজে প্রচার ও প্রচলিত করুন, উজ্জীবিত করুন; অনেক অনেক সওয়াব পাবেন।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি ইসলামে কোন ভালো রীতি (বা কর্ম) প্রবর্তিত করে তার জন্য রয়েছে তার সওয়াব (প্রতিদান) এবং তাদের সমপরিমাণ সওয়াব যারা ঐ রীতির অনুকরণে আমল (কর্ম) করে। এতে তাদের কারো সওয়াব এতটুকু পরিমাণও হ্রাস করা হয় না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতি (বা কর্মের) সূচনা করে তার জন্য রয়েছে তার পাপ এবং তাদের সমপরিমাণ পাপও যারা ঐ রীতির অনুকরণে আমল (বা কর্ম) করে। এতে তাদের কারো পাপ এতটুকু পরিমাণ হ্রাস করা হয় না।" *(মুসলিম ১০১৭নং, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন ভালো রীতি প্রবর্তন করে তার জন্য নির্দিষ্ট সওয়াব রয়েছে, যতদিন সেই রীতির উপর আমল হতে থাকবে; তার জীবনকালে এবং তার মৃত্যুর পরেও; যতক্ষণ না তা বর্জিত হয়েছে। আর যে ব্যক্তি কোন মন্দ রীতির প্রচলন করে তার জন্য রয়েছে তার নির্দিষ্ট পাপ, যতক্ষণ না সে রীতি (বা কর্ম) বর্জন করা হয়েছে। আবার যে ব্যক্তি প্রতিরক্ষা-বাহিনীর কার্যে থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে পুনরুত্থিত হওয়া পর্যন্ত তার ঐ প্রতিরক্ষা-বাহিনীর কাজের সওয়াব জারী থাকে। *(ত্বাবারানীর কাবীর, সহীহ তারগীব ৬২নং)*

মহানবী ﷺ আরো বলেন, "এই মঙ্গলসমূহের রয়েছে বহু ভান্ডার। এই ভান্ডারগুলোর জন্য রয়েছে একাধিক চাবি। সুতরাং শুভসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য যাকে আল্লাহ আযযা অজাল্ল মঙ্গলের (দরজা খোলার) চাবিকাঠি এবং

আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিল।

এই হল সেই ব্যক্তির উদাহরণ, যে আমার আনুগত্য করে আমি যা আনয়ন করেছি তার অনুসরণ করে এবং সেই ব্যক্তির উদাহরণ, যে আমার অবাধ্য হয় এবং আমার আনীত সত্য বিষয়কে মিথ্যায়ন করে।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৪৮নং)*

আবূ হুরাইরা ؓ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আমার উপমা হল সেই ব্যক্তির মত, যে আগুন জ্বালালো। অতঃপর যখন তার চারিদিক উজ্জ্বল করে তুলল, তখন আগুন দেখে যে সব পোকা-মাকড় ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেসব তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করল। লোকটি তাদেরকে বাধা দিতে লাগল। কিন্তু তারা তাকে পরাস্ত করে আগুনে পড়তে লাগল।

সেইরূপ আমিও তোমাদের কোমর ধরে তোমাদেরকে আগুন হতে (পিছনের দিকে) টেনে ধরছি (এবং বলছি, জাহান্নাম থেকে পালিয়ে এস! জাহান্নাম থেকে পালিয়ে এস)। আর তা সত্ত্বেও তোমরা (আমাকে পরাস্ত করে) তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ছ!" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৪৯নং)*

আবূ মূসা আশআরী বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ আমাকে যে হেদায়াত ও ইল্‌ম সহকারে পাঠিয়েছেন, তার উদাহরণ হল মুষলধারা বৃষ্টি; যা কোন ভূখন্ডে বর্ষিত হয়েছে। সে ভূখন্ডের একাংশ ছিল উৎকৃষ্ট (উর্বর), যে বৃষ্টি গ্রহণ করে প্রচুর উদ্ভিদ ও ঘাস জন্মাল। সে ভূখন্ডের অন্য একাংশ ছিল কঠিন ও গভীর; যা পানি ধরে রাখল এবং তার দ্বারা আল্লাহ মানুষকে উপকৃত করলেন; তারা সেখান হতে পান করল, পান করাল, (সেচ করল) এবং তার দ্বারা ফসল লাগাল। সে ভূখন্ডের আর একাংশ ছিল কঠিন ও সমতলভূমি; যা পানি ধরে রাখল না এবং উদ্ভিদও জন্মালো না।

এই উদাহরণ হল সেই ব্যক্তির, যে আল্লাহর দ্বীন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছে এবং যা দিয়ে আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন তার দ্বারা তাকে উপকৃত করেছেন। ফলে সে (দ্বীন) শিক্ষা করেছে এবং শিক্ষা দিয়েছে। আর এটি সেই ব্যক্তিরও উদাহরণ, যে তার দিকে মাথা তুলেও দেখেনি এবং আল্লাহর সেই হেদায়াত গ্রহণ করেনি, যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৫০নং)*

অমঙ্গলের (দরজা বন্ধ করার) খিল করেছেন। আর ধ্বংস সেই বান্দার জন্য যাকে আল্লাহ অমঙ্গলের চাবিকাঠি ও মঙ্গলের (দরজা বন্ধ করার) খিল করেছেন।” *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ৬৩নং)*

সুতরাং কোন মৃত রীতি ও সুন্নতকে জীবিত করে যদি আপনি কল্যাণের চাবিকাঠি হতে পারেন, আপনার দ্বারা যদি কোন শরীয়ত-সম্মত ভালো কাজ নতুনভাবে চালু হয়ে যায়, তাহলে আপনি একজন মহান মানুষ।

হয়তো বা লোকে ‘নতুন হাদীস’ বা ‘নতুন ফতোয়া’ বলে আপনাকে ব্যঙ্গ করবে, তবুও আপনি তা পরোয়া না করে আমল করে যান। আল্লাহর ইচ্ছায় আজ না হয় কাল কেউ আপনার ঐ চালুকৃত সুন্নতের উপর আমল শুরু করবে এবং তার দেখাদেখি আরো অনেকে আমল করবে। আর তার ফলে তাদের সকলের সওয়াবের সমপরিমাণ সওয়াব আপনার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হয়ে যাবে।

জীবনের সময় তো গনা কয়েকটা দিন মাত্র। আপনি চেষ্টা করলেও আপনার আয়ু বৃদ্ধি করতে পারেন না। কিন্তু এমন কাজ অবশ্যই করতে পারেন, যে কাজের মাধ্যমে আপনার আয়ুর শতগুণ আমল আপনার আমলনামায় লিখিত হবে।

হাদীসের সাথে আদব

মহানবী ﷺ-এর প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা আমাদের জন্য ওয়াজেব। মহান আল্লাহ তাঁর তা’যীম করতে আমাদেরকে আদেশ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝٨ لِّتُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝٩﴾ (-)

অর্থাৎ, (হে নবী!) আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন

কর এবং রসূলকে সাহায্য ও সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা কর। *(সূরা ফাত্হ ৮-৯ আয়াত)*

রসূল ﷺ-এর প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শন করলে আমরা মুক্তি ও সাফল্যের পথ পেতে পারব। মহান আল্লাহ সে কথাও কুরআনে বলেন,

﴿فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلنُّورَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۝١٥٧﴾ ( )

অর্থাৎ, সুতরাং তার প্রতি যারা ঈমান রাখে, তাকে সম্মান ও সহযোগিতা করে এবং সেই আলোকের (কুরআনের) অনুসরণ করে, যা তার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, তারাই হল সফলকাম। *(সূরা আ’রাফ ১৫৭ আয়াত)*

প্রিয় নবীর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আছে। যদিও তিনি আমাদের মাঝে বেঁচে নেই, তবুও তাঁর প্রতি আমাদের সেই শ্রদ্ধা ও ভক্তি কম হওয়ার কথা নয়। তিনি নেই কিন্তু তাঁর ছেড়ে যাওয়া বাণী আছে। তাঁর বাণীর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি হওয়া উচিত। তিনি বেঁচে থাকলে আমাদের সামনে আমাদেরকে সম্বোধন করে আদেশ করলে তাঁর আদেশের প্রতি যে গুরুত্ব দিতাম, ঠিক সেই গুরুত্বই দেওয়া উচিত তাঁর অবর্তমানে তাঁর হাদীসের প্রতি। তবেই জানা যাবে, তাঁর প্রতি আমাদের ঈমান অতি পাকা।

মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে সেই আদবের কথা জানিয়ে বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝١ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَرْفَعُوٓا۟ أَصْوَٰتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِىِّ وَلَا تَجْهَرُوا۟ لَهُۥ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَٰلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَٰتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝٣﴾ (-)

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সামনে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করো না এবং তোমরা আপোসে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তার সাথে সেইভাবে উচ্চস্বরে কথা বলো না; কারণ এতে তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের আমলসমূহ পন্ড হয়ে যাবে। যারা আল্লাহর রসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। *(সূরা হুজুরাত ১-৩ আয়াত)*

এই আদব মানতে আমাদের উচিত হলো ঃ-

তাঁর কবরের পাশে গিয়ে উচ্চস্বরে কথা বলব না।

হাদীসের উপর নিজের কিংবা আর কারো রায়কে প্রাধান্য দিব না।

কিতাব ও সুন্নাহর পরিপন্থী কোন কথা বলব না।

কুরআন ও হাদীসের নীতি ব্যতিরেকে কোন ফায়সালা দিব না।

কুরআন ও হাদীসের অনুমোদন ছাড়া কোন ইবাদত বা দ্বীনী কাজ করব না।

শরীয়তে কোন নতুন ইবাদত বা রীতি (বিদআত) আবিষ্কার করব না।

কুরআন ও হাদীসের ফায়সালা ঘাড় পেতে মেনে নেব।

হাদীস শোনার পর কোন প্রকারের কূট প্রশ্ন বা অবজ্ঞা প্রদর্শন করব না।

কোন ব্যাপারে হাদীস শোনার পর নিজের বুঝে আর কোন তর্ক করব না।

হাদীস শোনার পর 'কিন্তু, কেন, ধুৎ, হুঁঃ' শব্দ মনের ভিতরেও রাখব না।

হাদীস শোনার পর তা প্রত্যাখ্যান করব না।

রসূল ﷺ, তাঁর হাদীস বা হাদীসের উলামা নিয়ে কোন প্রকারের ব্যঙ্গ ও কটাক্ষ করব না।

হাদীসের কথা ও কিতাবকে তুচ্ছ জ্ঞান করব না।

হাদীসের শিক্ষা ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করব না।

কুরআন ও হাদীসের অভিজ্ঞ কোন আলেমের সাথে বিনা ইল্‌মে তর্ক করব না। বরং উলামার প্রতি যথেষ্ট আদব রেখে কথা বলব।

যেহেতু আমরা মুমিন। আমাদের থাকবে যথেষ্ট আদব। আমরা বেআদব হতে পারি না।

মহানবী ﷺ-এর সাহাবাগণ আনুগত্য ও আদবের প্রকৃষ্ট নমুনা রেখে গেছেন। তিনি থুতু বা কফ ফেললে তাঁদের কেউ নিজ হাতে লুফে নিয়ে চেহারা ও দেহে মেখে নিয়েছেন, যখন যা আদেশ করেছেন, বিনা দ্বিধায় সত্বর তা পালন করেছেন, যখন তিনি ওযূ করেছেন, তখন তাঁর ওযূর পানি নেওয়ার জন্য যেন তাঁরা মারামারি করেছেন, যখন তিনি কথা বলেছেন, তখন সকলেই তাঁর সামনে নিজ নিজ কণ্ঠস্বর নিচু করে নিয়েছেন। আর তাঁর তা'যীমে কেউ তাঁর প্রতি গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে পারেননি। *(বুখারী)*

আমাদের তরফ থেকে তাঁর প্রতি এই শ্রেণীর তা'যীম প্রদর্শনের কোন উপায় নেই। কিন্তু তাঁর একনিষ্ঠ অনুগত হয়ে, তাঁর বাণীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং তাঁর সুন্নাহর অনুসরণ করে যথাসম্ভব তা'যীম প্রদর্শন করতে পারি।

মহানবী ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা

আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে মহানবী ﷺ-কে ভালোবাসে না। অবশ্য সে ভালোবাসার তারতম্য আছে; কারো কম আছে, কারো বেশী। কারো ভেজালমার্কা, কারো খাঁটি। কারো ভিতর-বাহির সর্বদিকময় অকপট, কারো বা কেবল বাহ্যিক কপট প্রেম।

আসলে খাঁটি নবী-প্রেম প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয। যে প্রেম না থাকলে কোন মুসলিম মুসলিম হতে পারে না। যেমন সেই প্রেম অন্য সকল ব্যক্তি ও বিষয় অপেক্ষা অধিক হওয়া জরুরী। তা না হলেও কারো ঈমান থাকতে পারে না।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَٰنَكُمْ أَوْلِيَآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ

ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَـٰنِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَـٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَـٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَـٰسِقِينَ ﴿٢٤﴾ (-)

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের পিতা ও ভাই যদি ঈমান (বিশ্বাস) অপেক্ষা কুফরী (অবিশ্বাস)কে শ্রেয় জ্ঞান করে তবে ওদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা ওদেরকে অভিভাবক করে; তারাই সীমালংঘনকারী। বল, 'তোমাদের পিতা-পুত্র, ভ্রাতৃবৃন্দ, পত্নী-পরিজন, অর্জিত ধন-সম্পদ সমূহ এবং সেই ব্যবসা-বাণিজ্য তোমরা যার অচল হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং প্রিয় বাসস্থানসমূহ যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তদীয় রসূল ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হয় তাহলে আল্লাহর আদেশ পাঠানো পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বস্তুতঃ আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। *(সূরা তাওবাহ ২৩-২৪ আয়াত)*

আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সেই প্রভুর কসম! যার হাতে আমার জীবন আছে, তোমরা কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন নও, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকটে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততির চেয়ে অধিক প্রিয়তর না হতে পেরেছি।" *(বুখারী ১৪নং)*

আনাস ﷺ বলেন "রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কোন বান্দা পূর্ণ মুমিন নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পরিবার, ধনসম্পদ এবং সমস্ত মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয়তর না হই।" *(মুসলিম ৪৪নং)*

একদা মহানবী ﷺ উমার বিন খাত্তাবের হাত ধরে ছিলেন। উমার তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমার জীবন ছাড়া সকল জিনিস থেকে

আমার নিকট প্রিয়তম। এ কথা শুনে মহানবী ﷺ বললেন, "না। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে। যতক্ষণ না আমি তোমার নিকট তোমার জীবন থেকেও প্রিয়তম হতে পেরেছি (ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি মুমিন হতে পারো না)। উমার ﷺ বললেন, এক্ষণে আপনি আমার জীবন থেকেও প্রিয়তম। তখন তিনি বললেন, "এখন (তুমি মুমিন) হে উমার!" *(বুখারী)*

মহানবী ﷺ-কে সবার চেয়ে অধিক ভালোবাসার ফল অতি মধুর। তাঁকে সব কিছু থেকে অধিক ভালোবাসলে ঈমানের মিষ্টতা পাওয়া যায়। আনাস ﷺ বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, "যার মধ্যে তিনটি বস্তু পাওয়া যাবে, সে ঐ তিন বস্তুর মাধ্যমে ঈমানের মিষ্টতা অনুভব করবে। (১) আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ তার নিকট সর্বাধিক প্রিয়তম হবে, (২) কোন ব্যক্তিকে সে একমাত্র আল্লাহর জন্য ভাল বাসবে এবং (৩) সে (মুসলমান হওয়ার পর) পুনরায় কুফরীতে ফিরে যেতে এমন অপছন্দ করবে, যেমন সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে।" *(বুখারী ১৬, মুসলিম ১/৬৬)*

তাঁকে ভালোবাসলে তাঁর সাথে হাশর হবে, বেহেশ্তে তাঁর সঙ্গলাভ হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে এসে জিজ্ঞাসা করল, "হে আল্লাহর নবী! সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি, যে ব্যক্তি কোন এক সম্প্রদায়কে ভালবাসে অথচ সে তাদের মত আমল করতে পারে না?"

উত্তরে নবী ﷺ বললেন, "যে যাকে ভালবাসে সে তার সঙ্গী হবে।" *(বুখারী ১০/৫৫৭ মুসলিম ৪/২০৩৪)* অর্থাৎ, জান্নাতে সে তার সঙ্গী হবে। *(উমদাতুল ক্বারী ২২/১৯৭)*

একদা সওবান ﷺ নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনি আমার নিকট আমার জান-মাল, সন্তান-সন্ততি অপেক্ষা অধিক প্রিয়। বাড়িতে অবস্থানকালে আপনার স্মরণ হলে আপনাকে দর্শন না করা পর্যন্ত ধৈর্য হয় না, তখন আপনার নিকট এসে সাক্ষাৎ করি। কিন্তু যখন আপনার ও আমার

মৃত্যুর কথা স্মরণ করি, তখন ভাবি যে, আপনি যখন জান্নাতে প্রবেশ করবেন, তখন আপনি নবীদের সঙ্গে বাস করবেন। আর আমি যখন জান্নাতে প্রবেশ করব, তখন আপনার সঙ্গে হয়তো সাক্ষাৎ হবে না। এই ভেবে ভীষণ শঙ্কিত হই।’ এ কথা শুনে মহানবী ﷺ তাঁকে কোন উত্তর দিলেন না। অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হল,

﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ

وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّـٰلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُو۟لَـٰٓئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾ ﴾ ( )

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে, তারা (পরকালে) ঐ সমস্ত মহান ব্যক্তিদের সঙ্গে থাকবে, যাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ নবীগণ, সত্যবাদীগণ, শহীদগণ এবং সৎব্যক্তিগণের সঙ্গে। *(সূরা নিসা ৬৯ আয়াত)*

যে মহানবী ﷺ-কে ভালোবাসবে, সে তাঁর আদর্শে আদর্শবান হতে অনুপ্রাণিত হবে, তাঁর অনুসরণে আমল করতে উদ্বুদ্ধ হবে। আরবী কবি বলেন,

অর্থাৎ, আমি নেক লোকদেরকে ভালোবাসি, অথচ আমি তাঁদের শ্রেণীভুক্ত নই। সম্ভবতঃ আল্লাহ আমাকে নেক লোক হওয়ার তওফীক দান করবেন।

প্রিয় নবী ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসার মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব আরোপ করে উর্দু কবি বলেন,

“মুহাম্মাদ কি জিস দিল মেঁ উলফত না হোগী,
সমঝ লো কে কিসমত মেঁ জান্নাত না হোগী।
করে জো ইত্বাআত মুহাম্মাদ কী দিল সে,
উসে পীর ও মুরশিদ কী হাজত না হোগী।
ভটকতা রহা হ্যায়, ভটকতা রহেগা,
মুহাম্মাদ সে জিসকো আকীদত না হোগী।”

অর্থাৎ, যার হৃদয়ে মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রেম নেই, বুঝে নেবেন যে, তার ভাগ্যে জান্নাত নেই। যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ অন্তরে মুহাম্মাদ ﷺ-এর আনুগত্য করে, সে ব্যক্তির কোন পীর-মুর্শিদের দরকার নেই। সে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয়ে ফিরছে এবং পথভ্রষ্ট হয়েই ফিরতে থাকবে, যে ব্যক্তির মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি ভক্তি না থাকবে।

যদি বাহ্যিক রূপ দেখে তাকে ভালোবাসতে চান, তাহলে তিনি ছিলেন পূর্ণিমার চাঁদের মত, তাঁর দেহের ঔজ্জ্বল্য ছিল সূর্যের মত। তাঁর রূপের বর্ণনা দিয়ে আরবী কবি বলেন,

অর্থাৎ, হে নবী! আপনি যেন প্রত্যেক ত্রুটি থেকে পবিত্ররূপে সৃষ্টি হয়েছেন। যেন আপনি নিজের ইচ্ছামত রূপ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছেন।

আপনার থেকে অধিক সুন্দর কোন চক্ষু দর্শন করেনি। আর আপনার থেকে অধিক উত্তম (সন্তান) নারীরা জন্ম দেয়নি।

নবীকে ভালোবাসুন। কিন্তু সে ভালোবাসা যেন নির্মল হয়, বিশুদ্ধ হয়। সেই ভালোবাসার দাবী কেবল হৃদয় ও মুখের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না হয়। বরং তাঁর ভালোবাসার মাধ্যমে যেন আমরা আল্লাহর ভালোবাসা পেতে পারি। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ

وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾ ﴾ ( )

অর্থাৎ, (হে নবী!) বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমার অনুসরণ কর তাহলেই আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। *(সূরা আলে ইমরান ৩১ আয়াত)*

করতেন। একদা তিনি সোনার মোহর-অঙ্গুরীয় তৈরী করলেন। তা দেখে তাঁরাও তৈরী করে ব্যবহার করতে লাগলেন। অতঃপর তিনি তা ফেলে দিয়ে বললেন, "আমি আর কোনদিন তা ব্যবহার করব না।" তা দেখে তাঁরাও নিজ নিজ অঙ্গুরীয় ফেলে দিলেন। *(বুখারী ৭২৯৮নং)*

একদা নামায পড়তে পড়তে জিবরীল ﷺ মারফৎ মহানবী ﷺ তাঁর জুতায় নাপাকী লেগে থাকার সংবাদ পেলে তিনি তা খুলে ফেলে বাম দিকে রাখলেন। তা দেখে সাহাবাগণ সকলে নিজ নিজ জুতা খুলে ফেললেন। নামায শেষে তিনি তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমাদেরকে তোমাদের জুতা খুলে ফেলতে কে উদ্বুদ্ধ করল?" তাঁরা বললেন, 'আমরা দেখলাম, আপনি আপনার জুতা খুলে ফেলেছেন, তাই আমরাও আমাদের জুতা খুলে ফেললাম।' তিনি বললেন, "জিবরীল আমাকে খবর দিলেন যে, তাতে নাপাকী লেগে আছে" (তাই আমি খুলে ফেলেছিলাম। তোমাদের জুতায় নাপাকী না থাকলে তা খুলে ফেলা জরুরী ছিল না।) *(আবূ দাঊদ, দারেমী, মিশকাত ৭৬৬নং)*

ভক্তি ও অনুকরণের এত আগ্রহ তাঁদের হৃদয়ে ছিল যে, যে বিষয়ে তা বিধেয় নয়, সে বিষয়েও তাঁরা তাঁর অনুকরণ করতেন।

সুন্নাহর হিকমত ও যৌক্তিকতা বুঝে না এলেও সাহাবাগণ তা পালন করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। কেবল ভক্তির সাথে তাঁর অনুকরণ করে যেতেন তাঁরা। একদা উমার ﷺ হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন দেওয়ার সময় বলেছিলেন, 'আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে চুমা দিচ্ছি। অথচ আমি জানি যে, তুমি কোন উপকার করতে পার না, অপকারও না। তবে যদি আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে চুম্বন দিতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে চুম্বন দিতাম না।' *(বুখারী, মুসলিম ১২৭০নং)*

মহানবী ﷺ-এর আদেশ পালন করার জন্য সাহাবাগণ শশব্যস্ত হয়ে পড়তেন। ভক্তি ও সমীহতে পরিপূর্ণ তাঁর যে কোন নির্দেশ মানতে তৎপর হয়ে উঠতেন। একদা আল্লাহর নবী ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ মসজিদে এলেন। তিনি সকলকে বসতে আদেশ করলে তা শুনেই

বলাই বাহুল্য যে, মহানবী ﷺ-এর নাফরমানি করে তাঁর ভালোবাসার দাবী মিথ্যা। তাঁর নির্দেশ পালন না করে তাঁর প্রশংসায় ভক্তিমূলক গজল-গীতি পাঠ করা প্রকৃত প্রেমের পরিচয় নয়। কাজে অমান্য করে কথায় প্রেমের বুলি ঝাড়লে কি সত্যিপক্ষে ভালোবাসা হয়? আরবী কবি বলেছেন,

অর্থাৎ, তুমি রাসূলের নাফরমানি করে তাঁর প্রেম প্রকাশ কর। এটা তো সর্বযুগে এক অদ্ভুত ব্যাপার! তোমার প্রেম যদি সত্য হত, তাহলে অবশ্যই তুমি তাঁর আনুগত্য করতে। কারণ প্রেমিক তো প্রেমাস্পদের অনুগত হয়।

অতএব প্রিয়তমের কথামত আমল করুন, তাঁর বাণী প্রচার করে তাঁকে তথা দ্বীনে ইসলামকে সাহায্য করুন। তবেই আপনি প্রকৃত নবী-প্রেমিক।

সাহাবা ﷺ-গণের সুন্নাহর অনুসরণ করার কতিপয় নমুনা

সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন আল্লাহর রসূল ﷺ-এর একান্ত অনুগত ও অনুসারী। তাঁরা তাঁদের প্রত্যেক কাজে তাঁর পরামর্শ নিয়ে চলতেন, প্রত্যেক সমস্যার সমাধান নিতেন তাঁর কাছে, প্রত্যেক বাদ-বিসম্বাদের মীমাংসা গ্রহণ করতেন তাঁর কাছে, প্রত্যেক মামলার মোকদ্দমা পেশ করতেন তাঁর দরবারে।

তাঁরা তাঁর আদেশ নির্দ্বিধায় পালন করতেন, তাঁর নিষেধ নিঃসংকোচে মান্য করতেন, খাস না হলে তাঁর প্রত্যেক ইবাদত, ব্যবহার ও কাজকর্মে তাঁরা তাঁর অনুকরণ করতেন।

আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁদেরকে নিজের আনুগত্য ও অনুকরণ করতে আদেশ করতেন এবং তা পালন না করা হলে তিনি রাগান্বিত হতেন।

অগাধ ভক্তিতে তাঁর প্রত্যেক কাজে তাঁরা তাঁর অস্বাভাবিক অনুকরণ

ইবনে মাসউদ দরজার উপরেই বসে গেলেন। তা দেখে নবী ﷺ তাঁকে বললেন, "(ভিতরে) এস হে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ!" *(আবূ দাঊদ ১০৯১নং, হাকেম ১/৪২৩, বাইহাক্বী ৩/২১৮)*

মহানবী ﷺ-এর সঙ্গে এক ব্যক্তি আসরের নামায পড়ে কতিপয় আনসারদের নিকট বেয়ে পার হয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকে বাইতুল মাক্বদেসের দিকে মুখ করে নামায পড়তে দেখে কসম খেয়ে বললেন যে, 'তিনি নবী ﷺ-এর সঙ্গে নামায পড়ে আসছেন, আর (কিবলা পরিবর্তন করে) নবী ﷺ-এর মুখ কা'বার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।" তাঁরা এই সংবাদ শুনেই আসরের নামাযের রুকুর অবস্থাতেই কা'বার দিকে ঘুরে পড়লেন। *(বুখারী ৪০নং)*

তাঁর কথাকে সাহাবাগণ এমন বিশ্বাস করতেন যে, না দেখেই তাঁর সপক্ষে সাক্ষি দিতেন। একদা মহানবী ﷺ সাওয়া বিন কাইস মুহারেবী বেদুঈনের নিকট থেকে একটি ঘোড়া কিনলেন। কিন্তু সে ঐ বিক্রয়ের কথা অস্বীকার করে এবং বলে, তুমি যদি আমার কাছে ঘোড়া কিনেছ, তাহলে সাক্ষী উপস্থিত কর। এ কথা শুনে খুযাইমাহ বিন সাবেত সাহাবী তাঁর সপক্ষে সাক্ষি দিয়ে বললেন, এই ঘোড়া তোমার নিকট থেকে উনি খরীদ করেছেন। নবী ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি তো আমাদের ঘোড়া ক্রয়-বিক্রয়ের সময় উপস্থিত ছিলে না, তাহলে সাক্ষি দিলে কিভাবে? তিনি বললেন, আপনি যা বলেন, তাতেই আমি আপনাকে সত্যবাদী বলে জানি। আরো জানি যে আপনি কখনো মিথ্যা বলবেন না।' মহানবী ﷺ বললেন, "যে ব্যক্তির সপক্ষে অথবা বিপক্ষে খুযাইমাহ সাক্ষি দেবে, সাক্ষির জন্য সে একাই যথেষ্ট।" আর তখন থেকেই তাঁর উপাধি পড়ে গেল 'ডবল সাক্ষি-ওয়ালা' সাহাবী। *(আবূ দাঊদ ৩৬০৭, নাসাঈ ৪৬৬১নং, ত্বাবারানী, হাকেম ২/২২, বাইহাকী ১০/১৪৬)*

এমনকি পার্থিব ব্যাপারেও তাঁরা তাঁর ভক্তির সাথে অনুকরণ করতেন। একদা তিনি সাহাবাদেরকে দেখলেন, তাঁরা খেজুর মোছার পরাগ-মিলন সাধন করছেন; অর্থাৎ, মাদা গাছের মোছা নিয়ে মাদী গাছের মোছার সাথে বেঁধে দিচ্ছেন। তিনি বললেন, "আমার মনে হয় ঐরূপ করাতে কোন লাভ নেই।

ঐরূপ না করলেও খেজুর ফলবে।" তাঁর এ মন্তব্য শুনে সাহাবাগণ তা ত্যাগ করলেন। কিন্তু খেজুর ফলার সময় দেখা গেল, খেজুর পরিপুষ্ট হয়নি; ফলে তার ফলনও ভালো হয়নি। তিনি তা দেখে বললেন, "কি ব্যাপার, তোমাদের খেজুরের ফলন নেই কেন?" তাঁরা বললেন, যেহেতু আপনি পরাগ-মিলন ঘটাতে নিষেধ করেছিলেন, সেহেতু তা না করার ফলে ফলন কম হয়েছে। তিনি বললেন, "আমি ওটা ধারণা করে বলেছিলাম। তোমরা তোমাদের পার্থিব বিষয় সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখ। অতএব তা ভালো হলে, তোমরা তা করতে পার।" *(মুসলিম ২৩৬১-২৩৬৩নং)*

যে সাধারণ খাবার মহানবী ﷺ খেতে ভালোবেসেছেন, সেই খাবার তাঁর মহব্বতে খেয়ে তাঁর সুন্নত পালন করেছেন সাহাবাগণ। কি অপূর্ব অনুকরণ ও অনুসরণের নযীর রেখে গেছেন তাঁরা!

একদা এক খাবারের মজলিসে আনাস رضي الله عنه মহানবী ﷺ-কে লাউ রাঁধা খেতে পছন্দ করতে দেখলেন। আর তখন থেকেই তিনি নিজে লাউ খেতে ভালোবাসতে লাগলেন। *(আহমাদ, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫/১৬৩)*

এমন কি সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন উমার আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নামাযের জায়গা খুঁজে সেই জায়গায় নামায পড়তেন। তিনি যে গাছের নিচে বিশ্রাম নিয়েছেন, সেই গাছের নিচে তিনিও বিশ্রাম নিতেন এবং সেই গাছ যাতে মারা না যায় তার জন্য তার গোড়ায় পানি দিতেন। *(উসুদুল গাবাহ ৩/৩৪১, সিয়ারু আ'লামুন নুবালা ৩/২১৩)*

তাঁর আচরণে নবী-অনুসরণ দেখলে মনে হতো তিনি একজন পাগল লোক। *(সিয়ারু আ'লামুন নুবালা ৩/২১৩)*

সাহাবীগণ যখন মহানবী ﷺ-এর নিকট থেকে কিছু বর্জন করার আদেশ শুনতেন, তখন লোভনীয় হলেও তা বিনা দ্বিধায় সত্বর বর্জন করতেন।

আনাস رضي الله عنه বলেন, খায়বারের দিন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, গাধাগুলিকে খেয়ে নেওয়া হচ্ছে! রাসুলুল্লাহ ﷺ চুপ থাকলেন। দ্বিতীয় বার পুনরায় এসে বলল, 'গাধাগুলি খেয়ে নেওয়া হচ্ছে।' তিনি ﷺ চুপ

থাকলেন। তৃতীয় বার এসে বলল, 'গাধাগুলি শেষ করে দেওয়া হচ্ছে।' অতঃপর নবী ﷺ একজন ঘোষণাকারীকে এই কথা ঘোষণা করার আদেশ করলেন, "আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল তোমাদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশ্ত খেতে নিষেধ করছেন।"

এই ঘোষণা শোনামাত্র ফুটন্ত হাঁড়ির গোশ্ত মাটিতে ঢেলে দেওয়া হল। *(বুখারী ৪১৯৯নং)*

মদ যখন হারাম করা হল, তখন সাহাবাগণ মদের বড় বড় পাত্র ভেঙ্গে দিলেন এবং কোন কোন পাত্র থেকে ঢেলে ফেলে দিলেন। আর তার ফলে মদীনার গলিতে মদ প্রবাহিত হল। *(বুখারী, মুসলিম ১৯৮০নং)* অতঃপর সেই অভ্যাসগত নেশার জিনিস আর কেউ ভক্ষণ করলেন না।

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ এক ব্যক্তির হাতে সোনার আংটি দেখলেন। তিনি তার হাত হতে তা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন, "তোমাদের কেউ কি ইচ্ছাকৃত দোযখের আঙ্গারকে হাতে নিয়ে ব্যবহার করে?"

অতঃপর নবী ﷺ চলে গেলে লোকটিকে বলা হল, 'তোমার আংটিটা কুড়িয়ে নিয়ে অন্য কাজে লাগাও। (অথবা তা বিক্রয় করে মূল্যটা কাজে লাগাও।)' কিন্তু লোকটি বলল, 'আল্লাহর কসম! আমি আর কক্ষনো তা গ্রহণ করব না, যা আল্লাহর রসূল ﷺ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।" *(মুসলিম ২০৯০নং)*

আংটিটা কুড়িয়ে তা বিক্রি করে তার মূল্য কাজে লাগানোতে অথবা আত্মীয় মহিলাকে দেওয়াতে কোন গোনাহ ছিল না। তবুও সাহাবী ﷺ রসূল ﷺ-এর তা'যীমে তা গ্রহণ করলেন না।

একদা আবূ জুহাইফা মহানবী ﷺ-এর সামনে ঢেকুর তুললে তিনি তাঁকে বললেন, "আমাদের সামনে তোমার ঢেকুর তোলা বন্ধ কর। পার্থিব জীবনে যে বেশী পরিতৃপ্ত হয়, কিয়ামতের দিনে সে বেশী ক্ষুধার্ত হবে।" এ হাদীস শোনার পর তিনি মরণকাল পর্যন্ত কোনদিন পেট পুরে খানা খাননি। তিনি রাতের খাবার খেলে, দুপুরের খাবার খেতেন না এবং দুপুরের খাবার খেলে আর রাতের

খাবার খেতেন না। *(আল-ইস্তিআব ৪/১৬২০, উসুদুল গাবাহ ৪/৪০০)*

বলা বাহুল্য, এ সব হল রসূলের চরম আনুগত্যের প্রকৃষ্ট নমুনা।

শুধু পুরুষরাই নয়; বরং মহিলারাও মহানবী ﷺ-এর অনুসরণের আজব আজব দৃষ্টান্ত ও নমুনা রেখে গেছেন। তাঁরাও প্রমাণ করেছেন যে, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর আদেশ পালনে এতটুকু দেরী, মনের ভিতরে কোন দ্বিধা-সংকোচ, কেন-কিন্তু বা কোন প্রকারের গয়ংগচ্ছ চলবে না।

এক সময় পুরুষ ও মহিলাদেরকে এক সঙ্গে পাশাপাশি রাস্তায় চলতে দেখে নবী ﷺ বলেছিলেন, "হে মহিলাগণ! তোমরা পিছিয়ে যাও। পথের মধ্যভাগে চলা তোমাদের জন্য সমীচীন নয়; বরং তোমরা পথের এক পাশ দিয়ে চলাচল কর।" মেয়েরা সঙ্গে সঙ্গে দেওয়াল ঘেষে চলতে আরম্ভ করল। এমন কি তারা এমনভাবে দেওয়াল ঘেষে চলতে লাগল যে, তার ফলে তাদের দেহের পরিহিত কাপড় দেওয়ালে আটকে যেত! *(আবু দাউদ ৫২৭২নং)*

একদা জনৈক মহিলা তার কন্যাকে সঙ্গে করে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হল। তার মেয়ের হাতে দুই খানা সোনার মোটা বালা ছিল। তা দেখে নবী ﷺ বললেন, "তুমি এর যাকাত প্রদান কর কি?" সে বলল, 'না।' তিনি ﷺ বললেন, "তাহলে তুমি কি পছন্দ কর যে, এই দুই খানা বালার পরিবর্তে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তোমাকে আগুনের তৈরি দুই খানা বালা পরিধান করাবেন?"

সঙ্গে সঙ্গে মহিলাটি বালা দুটি খুলে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে রেখে দিয়ে বলল, 'এই বালা দুই খানা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের জন্য।' *(আবু দাউদ ১৫৬৩, নাসাঈ)*

আমাদেরও উচিত সেইরূপ অনুসরণ করা -যদি আমরা সত্যপক্ষে তাঁর উম্মত হওয়ার দাবী রাখি তাহলে। আমাদের বক্ষঃস্থিত ঈমানের খোঁজ নিয়ে দেখা দরকার যে, আমরা কি সত্যপক্ষে তাঁর অনুসরণ করে তাঁকে ভালোবাসতে পেরেছি? আমরা মহান আল্লাহর ভালোবাসা লাভ করার জন্য কি তাঁর প্রেরিত রাসূলের প্রকৃত অনুসরণ করতে পেরেছি? মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ( )

অর্থাৎ-বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমার অনুসরণ কর তাহলেই আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। *(সূরা আলে ইমরান ৩১ আয়াত)*

আমরা কি আমাদের মনের বিশ্বাসে, মুখের কথায় ও কর্মজীবনের কাজে তাঁর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রমাণ করতে পেরেছি? আমাদের মাঝে কি এ সকল লক্ষণ আছে?

১। আমরা কি নবী ﷺ-এর সাক্ষাৎ লাভ ও তাঁর সঙ্গী হওয়ার আকাঙ্খা পোষণ করি এবং তা থেকে বঞ্চিত হওয়াকে পৃথিবীর অন্যান্য সকল বস্তু থেকে বঞ্চিত হওয়া অপেক্ষা অধিক কষ্টকর বলে মনে করি?

আমরা কি মহানবী ﷺ-এর সেই ভবিষ্যদ্বাণীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যাতে তিনি বলেছেন, "অবশ্যই আমার উম্মতের কিছু লোক হবে, যারা আমার পরবর্তীকালে আগমন করবে; (তারা আমাকে অত্যন্ত প্রগাঢ়ভাবে ভালোবাসবে) তাদের প্রত্যেকে এই আশা পোষণ করবে যে, যদি সে তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের বিনিময়ে আমার দর্শন লাভ করতে পারত!" *(আহমাদ ৫/১৫৬, মুসলিম ২৮৩২, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৪১৮, ১৬৭৬নং)*

২। আমরা কি নবী ﷺ-এর স্বার্থে নিজের জান ও মাল খরচ করার জন্য পূর্ণভাবে প্রস্তুত আছি?

৩। তাঁর সকল আদেশ পালন করা ও সমুদয় নিষিদ্ধ বস্তু থেকে বিরত থাকার মন-মানসিকতা কি আমাদের আছে?

৪। তাঁর সুন্নতের পূর্ণরূপ সাহায্য করা এবং শরীয়তের বিরোধী সকল বাধাকে প্রতিহত করার দায়িত্ব কি আমরা পালন করেছি?

৫। সকল ব্যক্তি ও বস্তু অপেক্ষা তাঁকে অধিক ভালোবাসা, সকল কিছুর ভালোবাসার উপর তাঁর ভালোবাসাকে প্রাধান্য দেওয়ার মত প্রমাণ কি আমরা

রাখতে পেরেছি?

৬। সকল মান্যবরের কথার উপর তাঁর কথাকে কি অগ্রাধিকার দান করতে পেরেছি?

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পিতা, সন্তান এবং সকল মানুষ অপেক্ষা প্রিয়তম হয়েছি।" *(বুখারী)*

যাঁরা সুন্নাহ পালন করেন, তাঁরা কি গোঁড়া?

সুন্নাহ পালন করলে অনেকে মনে করে, এটা বাড়াবাড়ি হচ্ছে। আসলে সুন্নাহ পালন করলে বাড়াবাড়ি বা গোঁড়ামি হয় না। অবশ্য সুন্নাহ পালন করতে গিয়ে অনেককে বাড়াবাড়ি করতে দেখা যায়। অনেক সময় সেই সুন্নাহ পালন না করলে তাঁরা ভর্ৎসনা ও তিক্ত সমালোচনা করেন। ছাত্র হলে তাকে মারধর করে থাকেন। যেমন চুল ছোট করা, টুপী ও লম্বা জামা পরা নিয়ে অনেককে অতিরঞ্জন করতে দেখা যায়। নামাযে পায়ে পা লাগানো নিয়ে নামাযের ভিতরেই পা নিয়ে ঠেলাঠেলি করতে নজরে পড়ে অনেক মানুষ। অতএব সুন্নত পালনে গোঁড়ামি নয়। গোঁড়ামি আছে সুন্নাহ পালন করতে গিয়ে অতিরঞ্জনে।

আসলে যিনি জীবনের প্রত্যেক পদক্ষেপে মহানবী ﷺ-এর সুন্নাহ পালন করেন, তিনি গোঁড়া নন। তিনি হলেন প্রকৃত সভ্য ও নেক মানুষ। যে নবীর চরিত্র ও শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়ে সারা পৃথিবী ধন্য, সে নবীর সুন্নাহ পালন করেই মানুষ প্রকৃত আলোকপ্রাপ্ত হতে পারে। আর গোঁড়ামি হল অতিরঞ্জন করার নাম। যে অতিরঞ্জন সুন্নাহতেও পছন্দনীয় নয়।

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা 'সওমে বিসাল' থেকে দূরে থাক।" এ কথা তিনি ৩ বার পুনরাবৃত্তি করলেন। সাহাবাগণ বললেন, 'কিন্তু হে আল্লাহর

রসূল! আপনি তো বিসাল করে থাকেন?' তিনি বললেন, "এ ব্যাপারে তোমরা আমার মত নও। কারণ, আমি রাত্রি যাপন করি, আর আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করিয়ে থাকেন। সুতরাং তোমরা সেই আমল করতে উদ্বুদ্ধ হও, যা করতে তোমরা সক্ষম।" *(বুখারী ১৯৬৬, মুসলিম ১১০৩নং, প্রমুখ)*

একদা তিন ব্যক্তি মহানবী ﷺ এর ইবাদত সম্পর্কে জানার জন্য তাঁর বিবিদের নিকট উপস্থিত হল। যখন তাঁর ইবাদতের কথা তাদেরকে বলা হল, তখন তারা তা স্বল্প জ্ঞান করল এবং বলল, নবী ﷺ-এর সাথে আমাদের তুলনা কোথায়? তাঁর তো পূর্বাপর সমস্ত গোনাহ আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। অতঃপর একজন বলল, 'আমি সর্বদা সারা রাত্রি নামায পড়তে থাকব। দ্বিতীয়জন বলল, আমি সর্বদা রোযা রাখতে থাকব; কখনও রোযা ত্যাগ করব না। তৃতীয়জন বলল, আমি সর্বদা স্ত্রী থেকে দূরে থাকব; কখনো বিবাহ করব না।

মহানবী ﷺ এর নিকট এ খবর পৌঁছলে তিনি তাদেরকে বললেন, "তোমরা কি সেই সকল লোক, যারা এই এই কথা বলেছ? আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহকে তোমাদের থেকে অধিকরূপে ভয় করে থাকি এবং তাঁর জন্য অধিক সংযম অবলম্বন করে থাকি। এতদ্‌সত্ত্বেও আমি কোন দিন রোযা রাখি এবং কোন দিন রোযা ছেড়েও দিই। (রাত্রে) নামাযও পড়ি, আবার ঘুমিয়েও থাকি এবং স্ত্রী-মিলনও করি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহ (তরীকা) থেকে বিমুখতা প্রকাশ করে, সে আমার দলভুক্ত নয়।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৪৫নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "প্রত্যেক কর্মের উদ্যম আছে এবং প্রত্যেক উদ্যমের আছে নিরুদ্যমতা। সুতরাং যার নিরুদ্যমতা আমার সুন্নাহর গন্ডির ভিতরেই থাকে সে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয় এবং যার নিরুদ্যমতা এ ছাড়া অন্য কিছুতে (সুন্নত বর্জনে) অতিক্রম করে সে ধ্বংস হয়ে যায়।" *(ইবনে আবী আসেম, ইবনে হিব্বান, আহমাদ, ত্বাহাবী, সহীহ তারগীব ৫৩ নং)*

অতএব সুন্নাহ পালন করুন। সুন্নাহ পালন করা গোঁড়ামি নয়। অবশ্য সুন্নাহ পালন করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করবেন না। যেহেতু সীমালংঘনকারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। যে ব্যক্তি নবীর সুন্নাহ পালন করে তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করবেন

না এবং তাকে গোঁড়া ভাববেন না।

বিদআতীরাই সুন্নাহর দুশমন

বিদআতী সুন্নাহ পছন্দ করে না। হাদীসের কথা বললে হেসে উড়িয়ে দেয়। যেহেতু বিদআতকেই সে আসল দ্বীন মনে করে। এতে ক্ষতি কি, ওতে অসুবিধা কি, এটা তো ভালো জিনিস, ওটা তো বিদআতে হাসানাহ' বলে অনেক বিদআত প্রচলিত করে থাকে। আর তার সঙ্গে মনের খেয়াল-খুশী যোগ হয়। ফলে কোন সহীহ হাদীসের কথা বললে তা আর গ্রহণ করতে মন চায় না। আর তখনই মনের বিরোধী হাদীসের প্রতি বিষ উদ্‌গারণ করে থাকে। হাদীসপন্থী আলেমকেও নিজের শত্রু মনে করে থাকে। অথচ বিদআতী একজন ভ্রষ্ট লোক।

আবূ ক্বিলাবাহ বলেন, যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে কোন হাদীস বর্ণনা করবে এবং সে বলবে, 'এ কথা ছাড়ুন, কুরআনের কথা বলুন' তখন জেনে নেবে যে, সে একজন গোমরাহ লোক। *(ত্বাবাক্বাতু ইবনে সা'দ ৭/ ১৮৪)*

ইমাম যাহাবী উক্ত কথার টীকায় বলেন, আর যখন বিদআতী বক্তাকে বলতে দেখবে যে, 'কুরআন ও একক বর্ণনাকারীর বর্ণিত (খবরে ওয়াহেদ) ছাড়ো, তোমার জ্ঞান-বিবেক কি বলছে তাই মানো' তখন জেনে নেবে যে, সে আবূ জেহ্‌ল। যখন কোন তাওহীদী (অদ্বৈতবাদ বা সর্বেশ্বরবাদ) মতাবলম্বী (সূফী)কে বলতে দেখবে যে, '(হাদীস) বর্ণনা ও জ্ঞান-বিবেক ছাড় এবং রুচি ও আবেগ যা বলছে তাই কর' তাহলে জেনে নেবে যে, ইবলীস মানুষের বেশে আবির্ভূত হয়েছে অথবা সে মানুষের দেহে প্রবেশ করেছে। সুতরাং তাকে দেখে যদি তুমি ভয় পাও, তাহলে সেখান হতে পলায়ন কর। নচেৎ তাকে চিৎ করে ফেলে তার বুকে বসে তার উপর আয়াতুল কুরসী পড় এবং গলা টিপে তাকে (সেই ইবলীসকে) হত্যা কর। *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' ৪/৪৭২)*

বার্বাহারী বলেন, 'যখন তুমি কাউকে দেখ যে, সে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাহাবাবর্গের মধ্যে কোন সাহাবীর বিরুদ্ধে কটুক্তি করছে, তখন জেনে নিও সে

ব্যক্তি প্রবৃত্তিপূজারী বিদআতী।' *(বার্বাহারী ১১৫পৃঃ ১৩৩ নং)*

তিনি আরো বলেন, 'যখন কাউকে শোনো যে, সে হাদীসের বিরুদ্ধে কটুক্তি করছে অথবা হাদীস প্রত্যাখ্যান করছে অথবা হাদীস ছাড়া অন্য কিছু মানতে চাচ্ছে, তখন তার ইসলামে সন্দেহ করো। আর সে যে একজন প্রবৃত্তিপূজক বিদআতী তাতে কোন সন্দেহই করো না।' *(ঐ ১১৫-১১৬পৃঃ, ১৩৪নং, শারহুস সুন্নাহ ৫১পৃঃ)*

তিনি বলেন, 'আর যখন দেখ যে, সে (দেশের মুসলিম) বাদশাহর জন্য বদ্দুআ করছে, তখন জেনে নিও সে ব্যক্তি প্রবৃত্তিপূজারী (বিদআতী)।' *(ঐ ১১৬পৃঃ, ১৩৬নং)*

আবূ হাতেম বলেন, 'আহলে বিদআহর চিহ্ন হল এই যে, সে আহলে হাদীসের ইজ্জতে আঘাত হানে।' *(শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি অলজামাআহ, লালকাঈ ১/১৭৯)*

তদনুরূপ যখন কাউকে দেখেন যে, সে সঊদিয়া বা অন্য কোন দেশের উলামায়ে সুন্নাহ বা সালাফী মতাদর্শের বিরুদ্ধে কটুক্তি করছে, তখন জেনে নিন সে ব্যক্তি একজন প্রবৃত্তিপূজারী (বিদআতী)।

ইবনুল কাত্ত্বান বলেন, 'দুনিয়াতে এমন কোন বিদআতী নেই, যে আহলে হাদীসকে ঘৃণা করে না।' *(আক্বীদাতুস সালাফ অআসহাবিল হাদীস, ইমাম সাবূনী ১০২পৃঃ, ১৬৩নং)*

আবূ ইসমাঈল সাবূনী বলেন, 'বিদআতীর আচরণে বিদআতের চিহ্ন প্রকাশ থাকে। তাদের সব চাইতে অধিক স্পষ্ট চিহ্ন ও নিদর্শন হল, নবী ﷺ-এর হাদীসের বাহক (মুহাদ্দেসীন)গণের প্রতি তারা দুশমনি করে, তাঁদেরকে ঘৃণা করে এবং তাঁদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। ' *(ঐ ১০১পৃঃ, ১৬২নং)*

কুতাইবাহ বিন সাঈদ বলেন, 'যখন তুমি কাউকে দেখবে যে, সে আহলে হাদীসকে ভালোবাসছে, তখন (জেনো যে,) সে সুন্নাহপন্থী। আর যে ব্যক্তি এর বিরোধিতা করে, সে ব্যক্তিকে বিদআতী জেনো।' *(মুক্বাদ্দামাতু মুহাক্কিক্বি কিতাব শিআরু আসহাবিল হাদীস, হাকেম ৭পৃঃ)*

আইয়ূব সাখতিয়ানী বলেন, 'আজকের বিদআতীদের কাউকে আমি জানি না যে, সে রূপক (দ্ব্যর্থবোধক আয়াত ও হাদীস) ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা তর্ক

করছে।' *(আল-ইবানাহ আন শরীআতি ফিরাকিন না-জিয়াহ অমুজানাবাতিল ফিরাকিল মাযমুমাহ, ইবনে বাত্ত্বাহ ২/৫০১, ৬০৫, ৬০৯)*

আবুল কাসেম আসবাহানী বলেন, সলফের আহলে সুন্নাহ বলেন যে, 'মানুষ যখন আষার (হাদীসে)র ব্যাপারে কটুক্তি করবে, তখন তার ইসলামে সন্দেহ হওয়া উচিত।' *(আল-হুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ ২/৪২৮) (বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ মণিমালা)*

হাদীস-বিরোধী রায়

অনেক মানুষ আছে যাদের সামনে হাদীস পেশ করা হলে তারা তা মানতে চায় না। বরং হাদীসের পরিবর্তে নিজের জ্ঞানকে অথবা নিজের মান্যবর কোন বুযুর্গকে প্রাধান্য দেয়। আর সেই রায় বা মতকে হাদীসের রায় বা মত থেকেও উত্তম ধারণা করে। অথচ যারা হাদীস মানে না, যারা হাদীসের ফায়সালা বাদ দিয়ে অথবা দৃষ্টিচ্যুত করে নিজেদের মত ও রায়কে প্রাধান্য দেয়, তারা আসলে নিজ খেয়াল-খুশীর পূজারী।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَكَ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴾

অর্থাৎ, অতঃপর ওরা যদি তোমার আহবানে সাড়া না দেয় তাহলে জানবে যে, ওরা তো কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশীরই অনুসরণ করে। আর আল্লাহর পথনির্দেশ বিনা যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে তার চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কে? *(সূরা কাসাস ৫০ আয়াত)*

পক্ষান্তরে হাদীসের রায় হল স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর রায়; যা ভুল হওয়ার কোন আশঙ্কাই নেই। আর মানুষের নিজস্ব রায় সঠিক হতে পারে এবং ভুলও।

হাদীসের মত হল সুনিশ্চিত ইল্ম। অন্যথা মানুষের নিজস্ব রায় সুনিশ্চিত ইল্ম নয়। আর মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَـٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ﴾ (   )

অর্থাৎ, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না (সে বিষয়ে মুখ খুলো না)। অবশ্যই কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় ওদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে। *(সূরা ইসরা ৩৬ আয়াত)*

হাদীস প্রত্যাখ্যান করলে ইল্ম নষ্ট হয়ে যাবে। হাদীসের আলেম ধ্বংস হয়ে গেলে ইল্ম উঠে যাবে। আর ইল্ম উঠে গেলে জাহেলদেরকে লোকেরা নেতা বানিয়ে নিয়ে, তাদেরকেই আলেম জ্ঞান করে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করবে। আর সেই ভ্রষ্ট জাহেলরা নিজেদের রায় দ্বারা ভুল ফতোয়া দিয়ে মানুষকে ভ্রষ্ট করবে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে যে ইল্ম দান করেছেন তা তোমাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার মত তুলে নেবেন না। বরং ইল্ম-ওয়ালা (বিজ্ঞ) উলামা তুলে নিয়ে ইল্ম তুলে নেবেন। এমতাবস্থায় যখন কেবল জাহেলরা অবশিষ্ট থাকবে, তখন লোকেরা তাদেরকেই ফতোয়া জিজ্ঞাসা করবে। ফলে তারা নিজেদের রায় দ্বারা ফতোয়া দেবে, যাতে তারা নিজেরা ভ্রষ্ট হবে এবং অপরকেও ভ্রষ্ট করবে। *(বুখারী ৭৩০৭ ও মুসলিম ২৬৭৩ নং)*

সাহ্ল বিন হুনাইফ বলেন, "তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে নিজেদের রায়কে সুনিশ্চিত মনে করো না।---" *(বুখারী ৭৩০৮, মুসলিম ১৭৮৫নং)* অর্থাৎ, কুরআন ও হাদীসের পরিপন্থী অথবা উভয়ের কোন নির্দেশ ব্যতিরেকে নিজস্ব কোন রায় দ্বারা দ্বীনের কোন আমল করো না।

এমনকি মহানবী ﷺও কোন কিছু জিজ্ঞাসিত হলে নিজের রায় দ্বারা বলতেন না। বরং তিনি অহীর অপেক্ষা করতেন। জিবরীল এসে সংবাদ ও সমাধান দিলে তবেই তিনি তা প্রকাশ ও প্রচার করতেন।

কুরআন ও হাদীসের ফায়সালা না মেনে যারা নিজেদের রায় দ্বারা ফায়সালা

নেয় ও দেয় তারা আসলে উম্মতের জন্য বড় ফিতনা স্বরূপ। মহানবী ﷺ বলেন, "আমার উম্মত সত্তরাধিক (তিয়াত্তর) ফির্কায় বিভক্ত হবে। এদের মধ্যে আমার উম্মতের জন্য সবচেয়ে বড় ফিতনার কারণ হবে একটি এমন সম্প্রদায়, যারা নিজ রায় দ্বারা সকল ব্যাপারকে ওজন করবে; আর এর ফলে তারা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করবে।" *(আল-ইবানাহ, ইবনে বাত্ত্বাহ ১/৩৭৪, হাকেম ৪/৪৩০, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১৭৯)*

উমার বিন খাত্তাব ﵁ বলেন, 'তোমরা রায়-ওয়ালা থেকে দূরে থেকো। কারণ তারা সুন্নাহর দুশমন। হাদীস মুখস্ত করতে অপারগ হয়ে নিজেদের রায় (জ্ঞান) দ্বারা কথা বলে (দ্বীনী বিধান দেয়) ফলে তারা নিজেরা ভ্রষ্ট হয় এবং অপরকেও ভ্রষ্ট করে।' *(লালকাঈ ১/১২৩, আল-ফক্বীহ অল-মুতাফাক্কিহ, বাগদাদী ১/১৮০, আল-জামে' ইবনে আব্দুল বার্র ৪৭৬পৃঃ)*

হযরত আলী ﵁ বলেন, 'দ্বীনে যদি রায় ও বিবেকের স্থান থাকত, তাহলে মোজার উপরের অংশ অপেক্ষা নিচের অংশই অধিক মাসাহযোগ্য হত। কিন্তু আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে তাঁর মোজার উপরের অংশে মাসাহ করতে দেখেছি।' *(আহমাদ, আবূ দাউদ ১৬২নং, দারেমী, মিশকাত ৫২৫নং)*

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﵁ বলেন, '---তোমরা কিছু সম্প্রদায়কে পাবে, যারা মনে করবে যে, তারা তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে আহবান করছে। অথচ আসলে তারা আল্লাহর কিতাবকে পৃষ্ঠপিছে বর্জন করবে। সুতরাং তোমরা 'ইল্‌ম' (সুন্নাহ) অবলম্বন করো। আর বিদআত রচনা করা থেকে দূরে থেকো। দূরে থেকো অতিরঞ্জন করা থেকে। দূরে থেকো (খুঁটিনাটি নিয়ে) গভীর চিন্তা-ভাবনা (বা ভেদ খোঁজা) থেকে। বরং তোমরা প্রাচীন পথ অবলম্বন কর।' *(দারেমী ১/৬৬, ১৪৩নং, আল-ইবানাহ ১/৩২৪, ১৬৯নং, লালকায়ী ১/৮৭, ১০৮নং, ইবনে অযযাহ ৩২পৃঃ)*

আওযায়ী বলেন, 'তুমি সলফের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চল; যদিও লোকে তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে। আর এঁর-ওঁর রায় থেকে দূরে থাক; যদিও কথা দ্বারা তা তোমার জন্য সুশোভিত করে পেশ করে।' *(আশ্‌-শারীআহ ৬৩পৃঃ)*

উমার বিন আব্দুল আযীয (রঃ) বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ যে সুন্নাহ

(তরীকা) দিয়ে গেছেন, তার কাছে অন্য কারো রায় চলে না। *(ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ২/২৮২)*

হাদীসের বিরুদ্ধে আপনার রায়ও কোন মূল্য রাখে না; যদিও আপনি নিজেকে বড় আলেম অথবা বড় ডাক্তার অথবা বড় বৈজ্ঞানিক অথবা বড় রাজনীতিবিদ্‌ অথবা বড় চিন্তাবিদ্‌ মনে করেন। তদনুরূপ কুরআন ও হাদীস-বিরোধী কারো রায় আপনি গ্রহণ করবেন না। কারণ তাতে আপনি ভ্রষ্ট হয়ে যাবেন।

হাদীস মানার ব্যাপারে আয়েম্মায়ে কিরামের উক্তি

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রত্যেক ইমাম ছিলেন হাদীসের অনুসারী। আর এ কথা কল্পনাও করা যেতে পারে না যে, তাঁদের কেউ আল্লাহর রসূল ﷺ-এর হাদীস জানা সত্ত্বেও তার বিপরীত ফায়সালা বা ফতোয়া দিয়ে গেছেন।

তাঁদের মধ্যে মতভেদ হওয়ার কারণ হল, তাঁদের অনেকের কাছে হাদীস পৌঁছেছে; কিন্তু অনেকের কাছে তা পৌঁছেনি। অনেকে সেই হাদীসকে সহীহ মনে করেননি।

আর এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, উম্মতের কেউই আল্লাহর নবীর সকল সহীহ হাদীস জানতেন না। তাঁর পরবর্তী চার খলীফা তাঁর সমস্ত হাদীস জানতেন না; জানা সম্ভব ছিল না। তাঁর প্রিয়তমা সহধর্মিনী মা আয়েশাও তাঁর সমস্ত হাদীস জানতেন না। এমন কি সবার চেয়ে বেশী হাদীস যিনি মুখস্থ রেখেছিলেন সেই সাহাবী আবূ হুরাইরাও মহানবী ﷺ-এর সকল হাদীস জানতেন না।

তদনুরূপ আয়েম্মায়ে কিরামগণের কেউই আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সকল হাদীস জানতেন না। বিশ্বের সব চাইতে অধিক প্রসিদ্ধ ও প্রামাণ্য গ্রন্থদ্বয় বুখারী ও মুসলিম শরীফ ইমাম চতুষ্টয়ের কেউই পড়া তো দূরের কথা; চোখে দেখেও যাননি; পড়া বা দেখা সম্ভবও ছিল না। যেহেতু বুখারী ও মুসলিম প্রণীত

হওয়ার আগেই তাঁদের অনেকেই এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন।

বলা বাহুল্য, ইমাম আবূ হানীফার জন্ম ৮০ হিজরী এবং মৃত্যু ১৫০ হিজরীতে, ইমাম মালেকের জন্ম ৯৩ হিজরী এবং মৃত্যু ১৭৯ হিজরীতে, ইমাম শাফেয়ীর জন্ম ১৫০ হিজরী এবং মৃত্যু ২০৪ হিজরীতে, আর ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের জন্ম ১৬৪ হিজরী এবং মৃত্যু ২৪১ হিজরীতে। পক্ষান্তরে বুখারী শরীফ প্রণেতা ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বুখারীর জন্ম ১৯৪ হিজরী এবং মৃত্যু ২৫৬ হিজরীতে। আর মুসলিম শরীফ প্রণেতা ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ কুশাইরীর জন্ম ২০৪ হিজরী এবং মৃত্যু ২৬১ হিজরীতে। আরো অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ প্রণেতাদের জন্ম-মৃত্যুও তাঁদের পরে। ইমাম আবূ দাউদের জন্ম ২০২ হিজরী এবং মৃত্যু ২৭৫ হিজরীতে, ইমাম তিরমিযীর জন্ম ২০৯ হিজরী এবং মৃত্যু ২৭৯ হিজরীতে, ইমাম নাসাঈর জন্ম ২১৫ হিজরী এবং মৃত্যু ৩০৩ হিজরীতে, আর ইমাম ইবনে মাজার জন্ম ২০৯ হিজরী এবং মৃত্যু ২৭৩ হিজরীতে।

সুতরাং লক্ষণীয় যে, হাদীস সঞ্চয়নের যুগ আসার পূর্বেই প্রায় সকল ইমামগণ ইহ-জগৎ ত্যাগ করেন। অতএব তাঁদের পক্ষে সকল (সহীহ) হাদীস জানা অসম্ভব ছিল। আর এ জন্যই তাঁরা হাদীস মানার জন্য স্পষ্টভাবে প্রত্যেকেই বিভিন্ন বাণী রেখে গেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) বলেন ঃ-

১। যখন হাদীস সহীহ হবে, তখন সেটাই আমার মযহাব। (হাদীস সহীহ হলে, সেটাই আমার মযহাব।)

২। কারো জন্য আমাদের কথা মেনে নেওয়া বৈধ নয়; যতক্ষণ না সে জেনেছে যে, আমরা তা কোত্থেকে গ্রহণ করেছি। (অর্থাৎ, দলীল না জেনে আমাদের অন্ধানুকরণ বৈধ নয়।)

৩। যে ব্যক্তি আমার দলীল জানে না, তার জন্য আমার উক্তি দ্বারা ফতোয়া দেওয়া হারাম।

৪। আমরা তো মানুষ। আজ এক কথা বলি, আবার কাল তা প্রত্যাহার করে

নিই। (এক দলীল অনুসারে আজ একটি মত পেশ করি, আবার অন্য দলীল অনুসারে কাল অন্য মত পেশ করি।)

৫। যদি আমি এমন কথা বলি, যা আল্লাহর কিতাব ও রসূলের হাদীসের পরিপন্থী, তাহলে আমার কথাকে বর্জন করো।

বলা বাহুল্য, প্রকৃত হানাফী (ইমাম আবূ হানীফার ভক্ত ও অনুসারী) হল সেই ব্যক্তি, যে ইমামের এই সকল উক্তির উপর আমল করে সহীহ হাদীসের মযহাবকেই নিজের মযহাব বলে মান্য করে।

ইমাম মালেক (রঃ) বলেন ঃ-

১। আমি তো একজন মানুষ মাত্র। আমার কথা ভুল হতে পারে আবার ঠিকও হতে পারে। সুতরাং তোমরা আমার মতকে বিবেচনা করে দেখ। অতঃপর যেটা কিতাব ও সুন্নাহর অনুকূল পাও, তা গ্রহণ কর। আর যা কিতাব ও সুন্নাহর প্রতিকূল তা বর্জন কর।

২। নবী ﷺ-এর পর তাঁর কথা ছাড়া অন্য কারো কথা গ্রহণীয় হতে পারে, আবার বর্জনীয়ও।

বলা বাহুল্য, প্রকৃত মালেকী (ইমাম মালেকের ভক্ত ও অনুসারী) হল সেই ব্যক্তি, যে ইমামের এই সকল উক্তির উপর আমল করে সহীহ হাদীস অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালনা করে।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন ঃ-

১। আমি যে কথাই বলি না কেন অথবা যে নীতিই প্রণয়ন করি না কেন, তা যদি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট থেকে বর্ণিত (হাদীসের) খিলাপ হয়, তাহলে সে কথা (ও সেই নীতি)ই মান্য, যা আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন। আর সেটাই আমার কথা।

২। মুসলিমরা এ বিষয়ে একমত যে, যে ব্যক্তির কাছে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সুন্নাহ স্পষ্ট হয়ে যাবে, তার জন্য অন্য কারো কথা মেনে তা বর্জন করা হালাল নয়।

৩। হাদীস সহীহ হলে, সেটাই আমার মযহাব।

৪। আমার পুস্তকে যদি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সুন্নাহর খিলাপ কোন কথা পাও, তাহলে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সুন্নাহর কথাকেই মেনে নিও এবং আমি যা বলেছি তা বর্জন করো।

৫। সহীহ সুন্নাহ (হাদীস) বিরোধী যে কথাই আমি বলেছি, সে কথা আমি আমার জীবনে এবং মরণের পরেও প্রত্যাহার করে নিচ্ছি।

৬। যখন দেখবে যে, আমি এমন কথা বলছি; যার বিপরীত কথা নবী ﷺ-এর সহীহ হাদীসে রয়েছে, তখন মনে করো যে, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

৭। যে কথাই আমি বলি না কেন, তা যদি সহীহ সুন্নাহর পরিপন্থী হয়, তাহলে নবী ﷺ-এর হাদীসই অধিক মান্য। সুতরাং তোমরা আমার অন্ধানুকরণ করো না।

৮। নবী ﷺ থেকে যে হাদীসই বর্ণিত হয়, সেটাই আমার কথা; যদিও তা আমার নিকট থেকে না শুনে থাক।

৯। (নিজ ছাত্র ইমাম আহমাদকে সম্বোধন করে বলেন,) হাদীস ও রিজাল সম্বন্ধে তোমরা আমার চেয়ে অধিক জান। অতএব হাদীস সহীহ হলে আমাকে জানাও, সে যাই হোক না কেন; কুফী, বাসরী অথবা শামী। তা সহীহ হলে সেটাই আমি আমার মযহাব বানিয়ে নেব।

বলা বাহুল্য, প্রকৃত শাফেয়ী (ইমাম শাফেয়ীর ভক্ত ও অনুসারী) হল সেই ব্যক্তি, যে ইমামের এই সকল উক্তির উপর আমল করে সহীহ হাদীস অনুযায়ী কর্ম করে।

ইমাম আহমাদ (রঃ) বলেন ঃ-

১। তোমরা আমার অন্ধানুকরণ করো না, মালেকেরও অন্ধানুকরণ করো না। অন্ধানুকরণ করো না শাফেয়ীর, আর না আওযায়ী ও ষওরীর। বরং তোমরা সেখান থেকে গ্রহণ কর, যেখান থেকে তাঁরা গ্রহণ করেছেন। (অর্থাৎ তাঁরা যেমন কিতাব ও সুন্নাহ থেকে মাসায়েল গ্রহণ করেছেন, তেমনি তোমরাও উভয় থেকেই মাসায়েল গ্রহণ কর।)

২। যে ব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর হাদীস প্রত্যাখ্যান করে, সে ব্যক্তি ধ্বংসোন্মুখ।

বলা বাহুল্য, প্রকৃত হাম্বলী (ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের ভক্ত ও অনুসারী) হল সেই ব্যক্তি, যে ইমামের এই সকল উক্তির উপর আমল করে সহীহ হাদীসকে গ্রহণ ও মান্য করে।

ইমামগণ সহীহ হাদীসের খিলাপ কোন কথা বলতেন না। আর এ জন্যই একই বিষয়ে তাঁদের একাধিক রায় ও মত পরিলক্ষিত হয়। দেখা যায় যে, ইমামের ছাত্র ইমামের কথা গ্রহণ করেননি। বরং উস্তায ইমাম যা বলেছেন, তার বিপরীত মতই গ্রহণ ও প্রচার করেছেন। কারণ, সহীহ সুন্নাহ উস্তাযের বিপক্ষে এবং ছাত্রের সপক্ষে তাই। আর এখান থেকেই স্পষ্ট হয় যে, কুরআন ও সহীহ হাদীসকে দৃষ্টিচ্যুত করে কারো, কোন ইমাম বা মযহাবের তকলীদ (অন্ধানুকরণ) বৈধ নয়। *(দ্রষ্টব্য ঃ সিফাতু সালাতিন্নাবী, আলবানী)*

শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী (রঃ) বলেন ঃ-

কিতাব ও সুন্নাহকে নিজের ইমাম বানিয়ে নাও, উভয়কে গভীর ধ্যান ও গবেষণার সাথে অধ্যয়ন কর এবং ঐ দুয়ের উপরই আমল কর। আর অন্য কারো কথা, মত ও প্রলাপে ধোকা খেও না। *(ফুতূহুল গাইব)*

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রঃ) বলেন ঃ-

যদি কখনো পীরের কোন হুকুম শরীয়তের বিপরীত মনে হয়, তাহলে মুরীদের সেই হুকুম তামীল করতে তাঁর অন্ধানুকরণ করবে না।

এত জানার পরেও যদি আপনি বলেন, আমার মযহাব কি কুরআন-হাদীস ছাড়াই হয়েছে নাকি?

তা তো অবশ্যই হয়নি। কিন্তু এটা তো মানবেন যে, অনেক সময় যয়ীফ ও জাল হাদীসকে ভিত্তি করেই মযহাবের ফতোয়া প্রচলিত হয়ে গেছে। পরে যখন জানা গেল যে, ঐ ফতোয়া সহীহ হাদীস বিরোধী, তখন কি ঐ ফতোয়া বর্জন ও সহীহ হাদীস গ্রহণ করতে আপনার মনে কোন দ্বিধা থাকতে পারে?

যদি বলেন, আমার ইমাম সাহেব কি জানতেন না যে, যে হাদীসকে ভিত্তি করে ফতোয়া দেওয়া হচ্ছে সেটি সহীহ নয়?

আমরা বলব যে, অবশ্যই জানতেন না এবং সেই সঙ্গে এও জানতেন না যে, এর বিপক্ষে কোন সহীহ হাদীস আছে। নচেৎ নিশ্চয়ই তিনি যয়ীফ হাদীস বর্জন করে সহীহ হাদীসকে গ্রহণ করে সেই অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন। আর এ কথা আপনি তাঁদের উপর্যুক্ত উক্তিগুলো থেকেই তো বুঝতে পারেন।

যদি বলেন, যয়ীফ তাঁরা না জানলে আপনারা কি করে জানলেন যে, ঐ হাদীস যয়ীফ? তাহলে আমরা বলব যে, সে কথা আমাদের মত ছোট মাথার মানুষ তো জানতে পারে না। বড় বড় মুহাদ্দেসীনে কিরামরাই সে কথা জেনে বলে গেছেন। আপনি অবশ্যই চার ইমামকেই স্বীকার করেন। এখন বলুন, যদি এক ইমাম বলেন, এটা হালাল, আর এক ইমাম বলেন, এটা হারাম। তাহলে আপনি যাঁর তাকলীদ করেন তাঁর কথাটাই চোখ বন্ধ করে মানবেন। পক্ষান্তরে যাঁর তাকলীদ করেন না, তাঁর কথাটিকে মানবেন না কেন? কোন্ যুক্তিতে একটি গ্রহণীয় এবং অপরটি বর্জনীয় বলে আপনি মনে করেন? দুজনই তো ইমাম। তাহলে দলীল দেখা কি জরুরী নয়। মতভেদের কারণ খোঁজা কি জরুরী নয়? অতঃপর যেটি যুক্তিযুক্ত সেই কথাটাকেই মেনে নেওয়া কি জ্ঞানীর কাজ নয়? এইরূপই কি ইমাম সাহেবগণের ছাত্রগণ করে যান নি? তা না করলে এত মযহাব হওয়ার কথা নয়।

ইমাম আবূ হানীফার ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান (রঃ) ও আবূ ইউসুফ (রঃ) দলীলের ভিত্তিতেই উস্তাযের প্রায় এক তৃতীয়াংশ মযহাবের খিলাপ আমল করেছেন। ইমাম মালেকের ছাত্র ইমাম শাফেয়ী দলীলের ভিত্তিতেই উস্তাযের খিলাপ ফতোয়া দিয়েছেন। ইমাম শাফেয়ীর ছাত্র ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল দলীলের ভিত্তিতেই উস্তাযের খিলাপ ফতোয়া দিয়েছেন। আর সে জন্যই তো মযহাব সৃষ্টি হয়ে গেছে। তাহলে দলীলের ভিত্তিতে মতভেদ হলে আমাদের কি উচিত নয়, সেই দলীলটাকেই জানা ও মানা, সহীহ, বিশুদ্ধ ও বলিষ্ঠ দলীলের খোঁজ করে তারই উপর আমল করা।

যদি বলেন, তাকলীদ বর্জন করলে ইজমার খিলাপ হয়ে কাফের হতে হয়, তাহলে আমরা বলব যে, ঐ জুজুর ভয়ে আপনি সহীহ হাদীস মানতে কুণ্ঠাবোধ

করেন না। কারণ, সহীহ হাদীস বর্জন করলে কি হতে হয় সেটাও তো আপনার অজানা নয়।

যদি বলেন, যাঁরা হাদীস-বিরোধী ফতোয়া দিয়ে এবং আমল করে গেছেন তাঁরা কি জাহান্নামী? আমরা কি তাঁদেরকে খারাপ বলব?

আমরা বলব, না। কারণ তাঁরা অবশ্যই হাদীসের জেনেশুনে বিরোধিতা করে যাননি। আমরা বরং তাঁদের জন্য দুআ করব,

﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَـٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝١٠ ﴾ (   )

অর্থাৎ, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন হিংসা বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের রব! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।' *(সূরা হাশ্র ১০ আয়াত)*

আর সেই সাথে তাঁদের হাদীস-বিরোধী ফতোয়া বর্জন করে হাদীস-সমর্থিত ফতোয়া অনুযায়ী আমল করব। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾

অর্থাৎ, তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কাউকে বন্ধু বা অভিভাবকরূপে অনুসরণ করো না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক। *(সূরা আ'রাফ ৩ আয়াত)*

সুন্নাহর অনুসরণ এবং নিজস্ব রায় ও বিদআহ বর্জন করার প্রতি সলফদের সযত্নতা

অনেক সময় অনেক মানুষ নিজের রায়ে একটা জিনিসকে সঠিক ভাবে। কিন্তু বাস্তবে সুন্নাহর দৃষ্টিতে সেটা সঠিক নয়। তখন নিজের রায় বা মতের বিরোধী

বলে সুন্নাহর রায়কে অনেকে মেনে নিতে পারে না। এমন লোক যে পূর্ণ ঈমানদার নয়, তা পূর্বেই জানা গেছে।

পূর্ণ ঈমানের পরিচয় হল, নিজের ভালো মনে করা রায়কে বর্জন করে সুন্নাহর ফায়সালাকে নিঃসংকোচে মেনে নেওয়া। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন, "আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মতভেদ ঘটে তবে সে বিষয় তোমরা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি ফিরিয়ে দাও। এটিই তো উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।" *(সূরা নিসা ৫৯ আয়াত)*

তাই তো সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنه গণ নিজের রায়ে কোন কোন আমলকে ভালো মনে করলেও, যখন তাঁদেরকে সুন্নাহর কথা বলা হত, তখন সাথে সাথে নিজের রায় বর্জন করে নির্দ্বিধায় সুন্নাহর অনুসরণ করতেন।

একদা একটি লোক চুরির দায়ে ধরা পড়লে দেখা গেল যে, পূর্বে দুইবার ধরা পড়ার ফলে তার একটি হাত ও একটি পা কেটে ফেলা হয়েছে। এরপর তার হাত কাটতে হবে, নাকি পা -এ নিয়ে আবূ বাকর সিদ্দীক رضي الله عنه সম্ভবতঃ ভাবলেন যে, তার হাত কেটে ফেললে, সে একেবারেই অক্ষম হয়ে যাবে। এমনকি পবিত্রতা ইত্যাদি অর্জন করার ক্ষমতাও তার থাকবে না। সুতরাং তিনি তার পা কাটতে আদেশ দিলেন। উমার رضي الله عنه এ কথা জানতে পারলে তিনি বললেন, 'সুন্নাহ হল হাত কাটা।' *(দারাকুত্বনী ৩/২১২, বাইহাকী ৭/৩১০, ইবনে আবী শাইবাহ ৫/৪৯০)* সুতরাং সুন্নাহ অনুযায়ী তার হাতই কাটা হল।

একদা এক পাগলিনী মহিলা ব্যভিচারে ধরা পড়লে উমার رضي الله عنه তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলতে আদেশ করলেন। আলী رضي الله عنه-এর নিকট এ খবর পৌঁছলে তিনি তাঁকে বললেন, আপনি কি জানেন না যে, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তিন ব্যক্তির নিকট হতে (কিরামান কাতেবীনের পাপ-পুণ্য লিখার) কলম তুলে নেওয়া হয়েছে; শিশু হতে, যতদিন না সে সাবালক হয়েছে, ঘুমন্ত ব্যক্তি হতে যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়েছে এবং পাগল ব্যক্তি হতে যতক্ষণ না সে সুস্থ হয়েছে।" এ হাদীস শুনে উমার ﷺ বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ।' অতএব সে মহিলাকে মুক্তি দেওয়া হল। *(আহমাদ ১/১৪০, আবূ দাঊদ ৪৩৯৯নং, হাকেম ৪/৪৩০)*

আবূ বাক্র সিদ্দীক رضي الله عنه বলেন, 'আমি এমন কোন জিনিস ছাড়বার নই, যা আল্লাহর রসূল ﷺ করতেন। আমি সেটাই আমল করেছি। আর আমার ভয় হয় যে, আমি যদি তাঁর কোন বিষয় ত্যাগ করে দিই, তাহলে আমি বক্রপথ অবলম্বন করে ফেলব।'

ইবনে বাত্ত্বাহ উক্ত উক্তির টীকায় বলেন, 'ভাই সকল! ইনি হলেন সিদ্দীকে আকবার; যিনি নিজ নবী ﷺ-এর কোন নির্দেশের বিরোধিতা করলে নিজের জন্য বক্রতা ও ভ্রষ্টতার আশঙ্কা করছেন। সুতরাং সেই যামানার লোকদের অবস্থা কি হতে পারে, যে যামানার লোকেরা তাদের নবী ও তাঁর আদেশ-নির্দেশকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে, তাঁর বিরোধিতা করে গর্ব প্রকাশ করে এবং তাঁর সুন্নাহ ও আদর্শ নিয়ে উপহাস-ঠাট্টা করে! আমরা আল্লাহর নিকট পদস্খলন থেকে রক্ষা চাই এবং মন্দ আমল থেকে মুক্তি চাই।' *(আল-ইবানাহ ১/২৪৬)*

হুযাইফাহ رضي الله عنه বলেন, 'হে কারীর দল! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমাদের পূর্ববর্তী (সাহাবাদের) পথ অবলম্বন কর। আল্লাহর কসম! তাতে যদি তোমরা (সুপথে অবিচলিত থেকে) অগ্রসর হতে পার, তাহলে বড় দূর পথ অগ্রসর হয়ে থাকবে। আর যদি তোমরা সে পথ ছেড়ে ডাইনে-বামে সরে যাও, তাহলে ভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে সরে যাবে।' *(লালকায়ী ১/৯০, ১১৯নং, আল-বিদ' অননাহয়ু আনহা, ইবনে অযযাহ ১৭পৃঃ, আস-সুন্নাহ, ইবনে নাস্র ৩০পৃঃ)*

ইবনে মাসঊদ رضي الله عنه বলেন, তোমরা (রসূল ﷺ ও সাহাবাগণের) অনুসরণ কর এবং বিদআত করো না। দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের জন্য তাঁরাই যথেষ্ট। আর প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।' *(ইবনে অয্যাহ ১৭পৃঃ, আস-সুন্নাহ ২৮-পৃঃ)*

ইবনে মাসঊদ رضي الله عنه জামাআতে নামায আদায় করার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, "যে ব্যক্তি কাল আল্লাহর সহিত মুসলিম হয়ে সাক্ষাৎ করতে আনন্দবোধ করে তার উচিত, আহবান করার (আযানের) সাথে সাথে ঐ নামাযগুলির হিফাযত করা। অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তোমাদের নবীর জন্য বহু হেদায়াতের পথ ও আদর্শ বিধিবদ্ধ করেছেন এবং ঐ (নামায)গুলি

হেদায়াতের পথ ও আদর্শের অন্তর্ভুক্ত। যদি তোমরা তোমাদের স্বগৃহে নামায পড়ে নাও, যেমন এই পশ্চাদ্‌গামী তার স্বগৃহে নামায পড়ে থাকে তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর আদর্শ ও তরীকা বর্জন করে ফেলবে। আর যদি তোমরা তোমাদের নবীর আদর্শ ও তরীকা বর্জন করে ফেল তাহলে তোমরা ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। --- *(মুসলিম ৬৫৪নং)*

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ বলেন, 'ইল্‌ম তুলে নেওয়ার আগে তোমরা ইল্‌মকে যত্ন কর। আর তোমরা বিদআত (নতুন কর্ম), বাড়াবাড়ি ও (খুঁটিনাটি নিয়ে) গভীর চিন্তা-ভাবনা (বা ভেদ খোঁজা) থেকে দূরে থাক। বরং তোমরা প্রাচীন পথ অবলম্বন কর।' *(দারেমী ১/৬৬, ১৪৩নং, আল-ইবানাহ ১/৩২৪, ১৬৯নং, লালকায়ী ১/৮৭, ১০৮নং, ইবনে অযযাহ ৩২পৃঃ)*

তিনি আরো বলেন, 'বিদআতে মেহনত করার চেয়ে সুন্নাহর উপর অল্প আমল অনেক ভাল।' *(আস-সুন্নাহ ৩০পৃঃ, লালকায়ী ১/৮৮, ১১৪নং, আল-ইবানাহ ১/৩২০, ১৬১নং)*

যুহরী বলেন, 'আমাদের বিগত উলামাগণ বলতেন, "সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার মাঝে পরিত্রাণ আছে। ইলম সত্বর তুলে নেওয়া হবে। ইলমের বিদ্যমানতা হল দ্বীন ও দুনিয়ার স্থিতি। আর ইল্‌ম নিশ্চিহ্ন হওয়ার মানে হল, এ সবের ধ্বংস হয়ে যাওয়া।" *(লালকায়ী ১/৯৪, ১৩৬নং, দারেমী ১/৫৮, ১৬নং)*

সাঈদ বিন জুবাইর মহান আল্লাহর বাণী ( ) (অর্থাৎ, সৎকাজ করে ও সৎপথে অটল থাকে) -এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'সুন্নাহ ও জামাআত অবলম্বন করে।' *(আল-ইবানাহ ১/৩২৩, ১৬৫নং, লালকায়ী ১/৭১, ৭২নং)*

আওযাঈ বলেন, 'সুন্নাহ আমাদেরকে যেদিকে ঘুরায়, আমরা সেদিকেই ঘুরব।' *(লালকায়ী ১/৬৪, ৪৭নং)*

ইমাম আহমাদ বলেন, 'যারা আপন খেয়াল-খুশী মত চলে (অর্থাৎ, যারা বিদআতী) তাদের কাছ থেকে কম-বেশী কিছুই লিখ না। বরং তোমরা সুন্নাহ (হাদীস) ও আসার-ওয়ালাদের সাহচর্য গ্রহণ কর।' *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' ১১/২৩১)*

উমার বিন আব্দুল আযীয তাঁর কোন এক গভর্নরের কাছে লিখা চিঠিতে বলেনঃ-

আমীরুল মু'মিনীন উমার বিন আব্দুল আযীযের তরফ থেকে আদী বিন আরতাআর প্রতি ঃ

অতঃপর আমি সেই আল্লাহর প্রশংসা করি, যিনি ছাড়া আর কেউ সত্যিকারের উপাস্য নেই।

অতঃপর আমি আপনাকে এই উপদেশ দিচ্ছি যে, আল্লাহ-ভীতি অবলম্বন করুন। তাঁর আদেশ পালনে মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করুন। তাঁর নবীর সুন্নাহর অনুসরণ করুন। বিদআতীদের প্রচলিত বিদআত বর্জন করুন। সুন্নাহই পালনের জন্য যথেষ্ট। সুতরাং আপনি সুন্নাহর তরীকাই অবলম্বন করে থাকুন। কারণ, সুন্নাহ তিনি প্রবর্তিত করে গেছেন, যিনি তার পরিপন্থী ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা, আহাম্মকী ও সুগভীরে প্রবেশকে জেনেছেন। অতএব আপনি তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকুন, যা নিয়ে ঐ গোষ্ঠী সন্তুষ্ট। আর অবশ্যই তাঁরা ইল্‌ম অনুযায়ী কর্ম করেছেন এবং সক্রিয় দূরদর্শিতার সাথে (নিষিদ্ধ ও সন্দিগ্ধ জিনিস থেকে) বিরত হয়েছেন। রহস্য উদ্‌ঘাটনে যদি কোন সওয়াব থাকত, তাহলে তাঁরা অবশ্যই সে কাজে মাহাত্ম্যের সাথে অধিক পারঙ্গম ছিলেন। পক্ষান্তরে যদি আপনি বলেন যে, এ কাজ (বিদআত) তো তাঁদের পর সৃষ্টি হয়েছে। (তাহলে জেনে রাখুন যে, ঐ বিদআত সেই রচনা করেছে, যে তাঁদের সুন্নাহর (তরীকার) অনুসরণ করেনি এবং তাঁদেরকে অপছন্দ করেছে। তাঁরাই হলেন অগ্রগামী। তাঁরা সে বিষয়ে যে কথা বলেছেন তাই যথেষ্ট। তাঁরা সে প্রসঙ্গে যে বয়ান দিয়েছেন তা সন্তোষজনক। তাঁদের থেকে যে নিম্নে তার ক্রটি আছে। আর তাঁদের থেকে যে ঊর্ধ্বে সে ঘৃণিত। তাঁদের পথে চলতে যারা অবহেলা প্রদর্শন করেছে তারা ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। আর তাঁরা এ ব্যাপারে সরল হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন।' *(আশ্‌-শারীআহ ২১২পৃঃ)*

ইবনে বাত্ত্বাহ বলেন, 'কি প্রশংসনীয় সে সম্প্রদায়; যাঁদের বুদ্ধি অতি সূক্ষ্ম, মস্তিষ্ক অতি স্বচ্ছ, নবীর অনুসরণে যাঁদের হিম্মত অতি উচ্চ। নবীর প্রতি তাঁদের চূড়ান্ত পর্যায়ের এত মহব্বত যে, তাঁরা তাঁর এইরূপ অনুসরণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন। অতএব ভাই সকল! তোমরা ঐ শ্রেণীর সুধীগণের পথ

অনুসরণ কর এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ কর, তাহলে তোমরা সুপথ পাবে, তোমরা (আল্লাহর) সাহায্য পাবে এবং তোমাদের সকল প্রয়োজন দূর হবে।' *(আল-ইবানাহ ১/২৪৫)*

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'তোমরা (সুন্নাহতে) অটল থাক এবং আসার (হাদীসের) পথ অনুসরণ কর। আর বিদআত থেকে দূরে থাক।' *(আল-ই'তিসাম, শাত্বেবী ১/১১২)*

আওযায়ী বলেন, 'তুমি সলফের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চল; যদিও লোকে তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে। আর এঁর-ওঁর রায় থেকে দূরে থাক; যদিও কথা দ্বারা তা তোমার জন্য সুশোভিত করে পেশ করে।' *(আশ্-শারীআহ ৬৩পৃঃ)*

ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) বলেন, 'হাদীস সহীহ হলেই সেটিই আমার মযহাব।' *(ইবনে আবেদীন, হাশিয়া ১/৬৩, সিফাতু সালাতুন নাবী ৪৬প্)*

তিনি আরো বলেন, 'যখন আমি এমন কথা বলি, যা আল্লাহর কিতাব ও রাসূল ﷺ-এর হাদীস বিরোধী, তখন তোমরা আমার কথা বর্জন করো।' *(আল-ঈক্বায ৫০পৃঃ)*

ইবনে অহাব বলেন, একদা ইমাম মালেক (রাঃ)কে ওযূর সময় পায়ের আঙ্গুলগুলোর (ফাঁকে ফাঁকে) খেলাল করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হলে উত্তরে তিনি বললেন, 'লোকেদের জন্য এটি বিধেয় নয়।' অতঃপর তাঁর নিকট থেকে মানুষের ভিড় কমে গেলে আমি গিয়ে বললাম, 'কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের নিকট হাদীস আছে।' তিনি বললেন, 'কেমন হাদীস?' আমি বললাম, 'হাদ্দাষানা---- মুস্তাউরিদ বিন শাদ্দাদ কুরাশী বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে তাঁর নিজের (হাতের) কনিষ্ঠা আঙ্গুল দ্বারা পায়ের আঙ্গুলগুলোর মধ্যবর্তী (ফাঁকে ফাঁকে) রগড়াতে দেখেছি।' হাদীস শুনে তিনি বললেন, 'অবশ্যই এ হাদীসটি হাসান। অথচ এটি এখন ছাড়া (এর পূর্বে আমি) কখনো শুনিনি!' অতঃপর আমি পরবর্তীতে শুনেছি, যখনই তিনি পায়ের আঙ্গুল খেলাল করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হতেন, তখনই তিনি তা করতে আদেশ দিতেন। *(বাইহাক্বী ১/৮১)*

ইমাম শাফেয়ী বলেন, আমাকে আবূ হানীফা বিন সিমাক বিন ফায্ল শিহাবী খবর দিয়েছেন, তিনি বলেন, আমাকে ইবনে আবী যি'ব মুক্বরী হতে এবং তিনি আবূ শুরাইহ কা'বী হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের বছরে বলেছেন, "যে ব্যক্তির (আত্মীয়) লোক খুন করা হবে, সে দুটি এখতিয়ারের মধ্যে উত্তমটিকে গ্রহণ করতে পারে; সে চাইলে দিয়াত (বিনিময় - অর্থদন্ড) গ্রহণ করতে পারে অথবা চাইলে খুনের বদলা খুন নিতে পারে।"

আবূ হানীফা বলেন, আমি ইবনে আবী যি'বকে বললাম, 'হে আবুল হারেষ! আপনি কি এ কথা মেনে নেবেন?'

আমার কথা শুনে তিনি আমার বুকে থাপ্পড় মারলেন, আমাকে খুব বেশী (চিৎকার করে) বকাবকি করতে লাগলেন এবং বেইজ্জত করলেন। তিনি বললেন, 'আমি তোমাকে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর হাদীস বর্ণনা করছি, আর তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা কর, আপনি কি তা মেনে নেবেন?! হ্যাঁ, অবশ্যই মেনে নেব। আর তা আমার জন্য এবং প্রত্যেক শ্রবণকারীর জন্য ফরয। আল্লাহ মানব জাতি থেকে মুহাম্মাদ ﷺ-কে নির্বাচিত করেছেন এবং তিনি তাঁর মাধ্যমে তাঁর হাতে তাদেরকে হেদায়াত করেছেন। তিনি তাঁর জন্য এবং তাঁর জবানে যা এখতিয়ার করেছেন, তাই এখতিয়ার করেছেন তাদের জন্য। সুতরাং সৃষ্টির জন্য জরুরী হল, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁর অনুসরণ করা। আর এ ছাড়া মুসলিমের কোন বাঁচার পথ নেই।----'

আবূ হানীফা বলেন, তিনি কথা বলতেই থাকলেন। পরিশেষে আমি আশা করতে লাগলাম যে, যদি তিনি এবারে চুপ করতেন। *(আর-রিসালাহ, শাফেয়ী ৪৫০পৃঃ)*

হুমাইদী বলেন, একদিন শাফেয়ী একটি হাদীস বর্ণনা করলে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কি এটা মেনে নেবেন?' প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, 'তুমি কি আমাকে কোন গীর্জা থেকে বের হতে দেখলে অথবা আমার দেহে (খ্রিষ্টানদের) কোমরবন্ধ দেখলে যে, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কোন হাদীস শুনব, অথচ তা মেনে নেব না?' *(হিলয়াতুল আওলিয়া ৯/১০৬, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' ১০/৩৪)*

একদা ইমাম শাফেয়ী নবী ﷺ হতে একটি হাদীস বর্ণনা করলেন।' এক ব্যক্তি

বলল, 'হে আবূ আব্দুল্লাহ! আপনি কি তা মানবেন? (সেই অনুযায়ীই ফায়সালা দেবেন?)'

এ কথা শুনে তিনি বললেন, 'কোন্ আকাশ ও পৃথিবী আমাকে স্থান দান করবে, যদি আমি আল্লাহর রসূল ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করি অথচ তা মান্য না করি?!' *(হিলয়াতুল আউলিয়া ৯/১০৬)*

ইমাম শাফেয়ী বলেন, 'মুসলিমরা এ ব্যাপারে একমত যে, যে ব্যক্তির নিকট আল্লাহর রসূল ﷺ-এর তরীকা স্পষ্ট হয়ে যাবে, সে ব্যক্তির জন্য অন্য কারো কথার ফলে তা বর্জন করা বৈধ নয়।' *(ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ২/২৮২)*

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি নবী ﷺ-এর হাদীস রদ্দ্ করে দেয় (গ্রহণ না করে), সে ব্যক্তি ধ্বংসোন্মুখ।' *(ত্বাবাক্বাতুল হানাবিলাহ ২/১৫, আল-ইবানাহ ১/২৬০)*

সুন্নাহ পালনের প্রতি সলফদের সযত্নতার এগুলি কয়েকটি নমুনা মাত্র। আসলে যাঁরা ছিলেন সুন্নাহর ধারক ও বাহক সুন্নাহর অনুসরণ যে তাঁদের প্রতিটি পদক্ষেপে হবে এবং তাঁরা যে নিজেদের অভিমত ও রায় বর্জন করে সুন্নাহর অনুসরণ করবেন সেটাই স্বাভাবিক। সেই স্বাভাবিকতা থাকা উচিত তাঁদের অনুসারীদের মাঝেও। সুন্নাহর তা'যীম আমাদের মনেও ঐ রকম স্থান পাওয়া উচিত, যে রকম স্থান পেয়েছিল আমাদের সলফদের মাঝে।

আমাদের উচিত নয়, চোখ বন্ধ করে কারো তাকলীদ করা। উচিত নয় কেবল একজন মান্যবরের কথা অনুযায়ী সহীহ হাদীস দ্বারা ফায়সালাকারী মান্যবরের কথা বর্জন করা। কিবলার দিক জানার জন্য কম্পাস ব্যবহার করা হয়। কিন্তু কিবলা সামনে দেখেও কম্পাস ব্যবহার করা কি বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে?

সুন্নাহ বা হাদীস-বিরোধী মানুষের ব্যাপারে সলফের ভূমিকা

সলফে সালেহীনদের যুগে যে কেউই হাদীসের বিরোধিতা করেছে; হাদীসের মোকাবেলায় নিজের বা অন্য কারো রায় পেশ করেছে অথবা হাদীস ছেড়ে কিয়াস বা নিজের বিবেককে প্রাধান্য দিয়েছে অথবা হাদীসের মত ছাড়া অন্যের মতকে উত্তম বলে মনে করেছে, তারই বিরুদ্ধে তাঁরা রাগান্বিত হয়েছেন, তার প্রতিবাদ করেছেন, তার সাথে কথা বলা এবং দেখা-সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছেন।

তাঁরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর হাদীসকে সর্বান্তঃকরণে মেনে নিয়েছেন, তা মানতে তাঁরা এতটুকু দ্বিধাবোধ করেননি। তাঁরা তা বিশ্বাস করেছেন, সত্যায়ন করেছেন এবং সেই অনুযায়ী আমলও করেছেন। আর সে ব্যাপারে তাঁদের মনে কোন প্রকার কিন্তু ছিল না। *(ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ৪/২৪৪)*

নিম্নে উক্ত দাবীরই কিছু উদাহরণ উদ্ধৃত হল ঃ-

অর্ধ সা' গম ফিতরা দেওয়ার ব্যাপারটা মুআবিয়া ؓ-এর নিজস্ব মত; যে মতের বিরোধিতা করেছেন আবূ সাঈদ খুদরী ؓ। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন আমাদের মাঝে ছিলেন, তখন আমরা ফিতরার সদকাহ প্রত্যেক ছোট ও বড়, স্বাধীন ও ক্রীতদাসের তরফ থেকে এক সা' খাদ্য; এক সা' পনির, এক সা' যব, এক সা' খেজুর অথবা এক সা' কিসমিস আদায় দিতাম। এইভাবেই আমরা সদকাহ আদায় দিতাম; অতঃপর একদা মুআবিয়া বিন আবূ সুফিয়ান হজ্জ অথবা উমরাহ করতে এসে (মদীনায়) এলেন। সেই সময় তিনি মিম্বরে খুতবাহ দেওয়ার সময় লোকেদের উদ্দেশ্যে যে সব কথা বলেছিলেন, তার মধ্যে একটি কথা ছিল এই যে, 'আমি মনে করি শামের অর্ধ সা' (উৎকৃষ্ট) গম এক সা' খেজুরের সমতুল্য।' ফলে লোকেরা তাঁর এ মত গ্রহণ করে নিল। আবূ সাঈদ বলেন, 'কিন্তু আমি ততটা পরিমাণ খাদ্যই আজীবন আদায় দিতে থাকব, যতটা পরিমাণ আমি পূর্বে (আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যুগে) আদায় দিতাম।' *(বুখারী ১৫০৮, মুসলিম ৯৮৫, আবূ দাঊদ ১৬১৬নং)*

ত্বাহাবী প্রমুখ হাদীসগ্রন্থের এক বর্ণনায় আছে, আবূ সাঈদ বলেন, 'আমি ততটা পরিমাণ খাদ্যই আদায় দিতে থাকব, যতটা পরিমাণ আমি আল্লাহর

রসূল ﷺ-এর যুগে আদায় দিতাম; এক সা' খেজুর, এক সা' যব, এক সা' কিসমিস অথবা এক সা' পনীর।' এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, 'অথবা অর্ধ সা' গম?' তিনি বললেন, 'না। এটা হল মুআবিয়ার মূল্য নির্ধারণ; আমি তা গ্রহণ করি না এবং তার (এ মতের) উপর আমলও করি না।' *(ইরওয়াউল গালীল ৩/৩৩৯)*

আবূ সাঈদ খুদরী رضي الله عنه বলেন, নবী ﷺ ঈদুল ফিতর ও আযহার দিনে ঈদগাহে বের হতেন। তিনি প্রথম কাজ হিসাবে নামায শুরু করতেন। অতঃপর লোকদের দিকে ফিরে দন্ডায়মান হতেন। লোকেরা নিজ নিজ কাতারে বসে থাকত। তিনি তাদেরকে নসীহত করতেন, অসিয়ত করতেন এবং বিভিন্ন আদেশ দিতেন। কোন যুদ্ধের সৈন্য প্রস্তুত করার থাকলে তা করতেন। কোন কিছুর আদেশ করার থাকলে তা করতেন। অতঃপর তিনি বাড়ি ফিরতেন। তাঁর পরবর্তীকালের লোকেরাও অনুরূপ করতে থাকল। অবশেষে একদা মদীনার আমীর মারওয়ানের সাথে ঈদের নামায পড়তে ঈদুল আযহা অথবা ফিতরের দিন বের হলাম। ঈদগাহে পৌঁছে দেখি কাষীর বিন সাল্‌ত মিম্বর তৈরী করে রেখেছে। নামায শুরু করার আগেই মারওয়ান তাতে চড়তে গেলেন। আমি তাঁর কাপড় ধরে টান দিলাম। তিনিও আমাকে টান দিলেন। অতঃপর মিম্বরে চড়ে নামাযের আগেই খুতবা দিলেন। (নামাযের পর) আমি তাঁকে বললাম, 'আল্লাহর কসম! আপনি (সুন্নত) পরিবর্তন করে ফেললেন।' উত্তরে তিনি বললেন, 'আবূ সাঈদ! আপনি যা জানেন তা গত হয়ে গেছে।' আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি যা জানি, তা না জানা জিনিস অপেক্ষা উত্তম।' মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, 'কক্ষনো না। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! আমি যা জানি, তার থেকে উত্তম কিছু আপনারা আনয়ন করতে পারেন না।' উত্তরে মারওয়ান বললেন, 'লোকেরা নামাযের পরে আমাদের খুতবা শুনতে বসে না। তাই নামাযের পূর্বেই খুতবা দিলাম।' *(বুখারী ৯৫৬, মুসলিম ৮৮৯নং)*

যেমন ইবনে আব্বাস رضي الله عنه এক সুন্নাহর ভিত্তিতে অন্য এক সুন্নাহর বিরোধিতা করার ফলে আবূ সাঈদ খুদরী رضي الله عنه প্রতিবাদ করেছিলেন।

আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসকে رضي الله عنه বলেছিলেন, 'হে ইবনে আব্বাস! আর কতদিন যাবৎ লোকদেরকে সূদ খাওয়াতে থাকবেন? শুধু আপনি কি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাহচর্য পেয়েছেন, আর আমরা পাইনি? শুধু আপনিই কি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন, আর আমরা শুনিনি?'

এ কথা শুনে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস বললেন, 'আপনি যা ভাবছেন তা নয়। বরং উসামা বিন যায়েদ আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সূদ তো কেবল ঋণেই পাওয়া যায়।" তা শুনে আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه বললেন, আল্লাহর কসম! ততদিন পর্যন্ত কোন গৃহের ছায়া আমাদেরকে আশ্রয় দেবে না যতদিন পর্যন্ত আপনি উক্ত ফতোয়ার উপর অটল থাকবেন! (অর্থাৎ, ততদিন আমি আপনার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করব না।) *(দেখুন, আল মাবসূত্ব, সারখাসী ২/১১১-১১২, মাওয়াক্বিফুশ্ শারীআতি মিনাল মাসারিফিল ইসলামিয়্যাতিল মুআসিরাহ)*

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رضي الله عنه এর ফতোয়া ছিল যে, কেবল ঋণের কারবারেই সূদ পাওয়া যায় এবং একই শ্রেণীভুক্ত দুটি জিনিসের কম-বেশী করে হাতে-হাতে লেন-দেনে সূদ হয় না। যেমন, সোনার পরিবর্তে সোনা বেশী (হাতে-হাতে) নেওয়া বৈধ। অথচ তা উবাদাহ বিন সামেত رضي الله عنه এর হাদীসের স্পষ্ট উক্তি অনুসারে হারাম ও সূদ। অবশ্য পরবর্তীকালে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رضي الله عنه এই হাদীস শুনে তাঁর উক্ত ফতোয়া দান করা হতে বিরত হয়েছিলেন। *(দেখুন, মুগনী, ইবনে কুদামাহ ৪/৩)*

আবুল মাখারিক বলেন, একদা উবাদাহ বিন সামেত উল্লেখ করলেন যে, নবী ﷺ এক দিরহামের বিনিময়ে দুই দিরহাম নিতে নিষেধ করেছেন। এ কথা শুনে এক ব্যক্তি বলল, 'হাতে হাতে (সাথে সাথে) নিলে কোন দোষ আছে বলে মনে করি না।'

প্রত্যুত্তরে উবাদাহ বললেন, 'আমি বলছি, নবী ﷺ বলেছেন। আর তুমি বলছ, তাতে কোন দোষ আছে বলে মনে করি না! আল্লাহর কসম! কক্ষনই এক গৃহের ছাদ আমাদেরকে ছায়া দেবে না। (জীবনে আমি তোমার ছায়া মারাব না।)' *(ইবনে মাজাহ ১৮, দারেমী ৪৪৩নং)*

আত্বা বিন য়্যাসার বলেন, এক ব্যক্তি ভাঙ্গা সোনা বা রুপার টুকরা তার যে ওজন তার থেকে বেশী ওজনের সোনা বা রুপার বিনিময়ে বিক্রি করল। তা দেখে আবূ দারদা ﷺ বললেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে এই ধরনের বিনিময় নিষেধ করতে শুনেছি। অবশ্য সমপরিমাণ ওজন হলে নিষেধ নয়।

লোকটি বলল, এতে কোন দোষ আছে বলে আমি মনে করি না।

প্রত্যুত্তরে আবূ দারদা ﷺ বললেন, 'অমুকের ব্যাপারে আমার জন্য কে ইনসাফ করবে? (আমার হয়ে কে অমুকের নিকট থেকে প্রতিশোধ নেবে?)। আমি ওকে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর হাদীস বর্ণনা করছি, আর ও আমাকে নিজের রায় সম্বন্ধে জ্ঞান দিচ্ছে! আমি সেই মাটিতে বাস করব না, যে মাটিতে তুমি বাস করবে।' *(আল-ইবানাহ, ইবনে বাত্ত্বাহ ৯৪নং)*

একদা হযরত মুআবিয়া ﷺ কা'বাগৃহের তওয়াফ করছিলেন। তিনি হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী ছাড়াও অন্য দুটি রুক্ন (কোণ)কে স্পর্শ করছিলেন। সঙ্গে ছিলেন ইবনে আব্বাস ﷺ। তাঁর এই আমল দেখে তাঁকে বললেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী ছাড়া অন্য রুক্ন স্পর্শ করতেন না।' মুআবিয়া বললেন, 'আল্লাহর গৃহের কোন রুক্নই তো পরিত্যাজ্য হওয়া উচিত নয়।' ইবনে আব্বাস বললেন, 'কিন্তু (মহান আল্লাহ বলেন,)

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (   )

অর্থাৎ, তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। *(সূরা আহযাব ২১ আয়াত)* এ কথা শুনে মুআবিয়া বললেন, 'ঠিকই বলেছ।' *(তিরমিযী, শাফেয়ী, আহমাদ)*

শুধু প্রতিবাদই নয়; বরং অনেক সময় সুন্নাহ-বিরোধী বা হাদীস অমান্যকারীর উপর রেগে উঠতেন।

আবূ কাতাদাহ বলেন, এক দল লোকের সাথে আমরা ইমরান বিন হুসাইনের কাছে ছিলাম। আমাদের সাথে বাশীর বিন কা'বও ছিলেন। ইমরান আমাদেরকে

হাদীস বয়ান করে বললেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "লজ্জাশীলতার সবটুকুই মঙ্গলময়।"

বাশীর বিন কা'ব তা শুনে বললেন, 'আমরা কোন কোন কিতাবে অথবা নীতিকথায় পাই যে, 'কিছু লজ্জাশীলতায় রয়েছে শান্তি ও (আল্লাহর জন্য) সম্মান। আর তার কিছুতে রয়েছে দুর্বলতা।'

বাশীরের এ কথা শুনে ইমরান রেগে উঠলেন এবং তাতে তার চোখ দুটি লাল হয়ে গেল। তিনি তাঁকে বললেন, 'কি ব্যাপার যে, আমি তোমাকে আল্লাহর রসূলের হাদীস বর্ণনা করছি, আর তুমি তার উল্ট কথা বলছ! তোমার বই-এর হাদীস বর্ণনা করছ!' *(বুখারী ৬১১৭, মুসলিম ৩৭নং)*

এ সংসারে বহু মানুষ আছে, যারা হাদীস শুনে তা গ্রহণ করতে চায় না। হাদীস শোনামাত্র তার ক্রটি বয়ান করার চেষ্টা করে, তার নির্দেশ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, আপত্তি আনে, তার বিরোধী অন্য কারো কথা এনে হাদীসের গুরুত্ব কম করতে চায়। কেউ বলে, 'হ্যাঁ, ঠিকই আছে। কিন্তু---।' কেউ বলে, 'কিন্তু এটা ডাক্তারী বা বিজ্ঞান মতে ঠিক নয়।' কেউ বলে, 'নতুন হাদীস।' কেউ বলে, 'ক্ষতি কি?' (অর্থাৎ, হাদীস এ কাজ করতে নিষেধ করছে, তা করলে ক্ষতি কি?) কেউ বলে, 'ঐ সব আর এ যুগে নেই।' কেউ বলে, 'অত কি মানতে পারা যায়?' কেউ বলে, 'কে আর মানছে?' ইত্যাদি।

কিন্তু দুর্বল ঈমানের ঐ সকল লোকেদের আপত্তি শুনে সলফে সালেহীন চুপ থাকতেন না; বরং রেগে যেতেন, জবাব দিতেন, বক্তার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন।

আব্দুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল ﷺ একদা হাদীস বয়ান করে বললেন, নবী ﷺ ঢিল ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন। আর বলেছেন, "ঢিল শিকার মারতে পারে না এবং দুশমন শায়েস্তা করতেও পারে না। কিন্তু তা চোখ নষ্ট করে ফেলে এবং দাঁত ভেঙ্গে দেয়।"

এ হাদীস শুনে এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহকে বলল, 'তাতে অসুবিধাটা কি?'

জবাবে তিনি তাকে বললেন, 'আমি তোমার কাছে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর

হাদীস বর্ণনা করছি, আর তুমি এই কথা বল? আল্লাহর কসম! তোমার সাথে কোনদিন কথা বলব না।' *(বুখারী ৫৪৭৯, মুসলিম ১৯৫৪, আল-ইবানাহ ৯৬নং)*

সালেম বিন আব্দুল্লাহ বলেন, একদা (আব্বা) আব্দুল্লাহ বিন উমার বললেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "তোমাদের মহিলারা মসজিদে যেতে অনুমতি চাইলে তোমরা তাদেরকে বাধা দিও না।"

এ কথা শুনে (আমার ভাই) বিলাল বিন আব্দুল্লাহ বলল, 'আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই ওদেরকে মসজিদ যেতে বাধা দিব।'

প্রত্যুত্তরে আব্দুল্লাহ তার মুখোমুখি হয়ে এমন খারাপ গালি দিলেন, যেমনটি আর কোনদিন শুনিনি। অতঃপর তিনি বললেন, 'আমি তোকে আল্লাহর রসূল ﷺ থেকে খবর দিচ্ছি। আর তুই বলিস, 'আল্লাহর কসম! আমরা ওদেরকে বাধা দেব।' *(মুসলিম ৪৪২নং)*

সঙ্গে কুরবানী না থাকলে আবূ বাক্‌র ؓ ও উমার ؓ ইফরাদ হজ্জকে উত্তম মনে করতেন। পক্ষান্তরে সহীহ সুন্নাহতে তামাত্তু হজ্জ উত্তম হওয়ার ব্যাপারে বর্ণনা আছে। সেই ভিত্তিতে ইবনে আব্বাস ؓ তামাত্তু হজ্জ উত্তম বলে ফতোয়া দিতেন। কিন্তু কেউ কেউ আবূ বাক্‌র ও উমারের কথা বললে তিনি বলেছিলেন, "অতি সত্বর তোমাদের উপর পাথর বর্ষণ হবে। আমি বলছি, 'আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন।' আর তোমরা বলছ, 'আবূ বাক্‌র ও উমার বলেছেন।" *(আহমাদ ১/৩৩৭, এর সনদটি দুর্বল। অবশ্য উক্ত অর্থেই সহীহ সনদে মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাকে একটি আসার বর্ণিত হয়েছে। দেখুনঃ যাদুল মাআদ ২/১৯৫, ২০৬)*

একই ব্যাপারে আব্দুল্লাহ বিন উমারকে এক ব্যক্তি বলল, 'আপনার আব্বা তো তামাত্তু হজ্জ করতে নিষেধ করেছেন।' এ কথা শুনে তিনি তাকে বললেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ-এর আদেশ অধিক মানার যোগ্য, নাকি আমার আব্বার?' *(যাদুল মাআদ ২/১৯৫)*

ক্বাতাদাহ বলেন, ইবনে সীরীন এক ব্যক্তিকে একটি হাদীস বয়ান করলেন। তা শুনে এক ব্যক্তি বলল, 'কিন্তু অমুক তো এই বলেন।'

প্রত্যুত্তরে ইবনে সীরীন বললেন, 'আমি তোমাকে নবী ﷺ-এর হাদীস বয়ান

করছি, আর তুমি বলছ, অমুক ও অমুক এই বলেছে?! আমি তোমার সাথে কোনদিন কথাই বলব না।' *(দারেমী ৪৪১নং)*

আবুস সায়েব বলেন, একদা আমরা অকী'র কাছে ছিলাম। তিনি তাঁর কাছের একটি লোকের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ (মক্কার হারামের জন্য প্রেরিত কুরবানীর উঁটের দেহ চিরে) চিহ্ন দিয়েছেন। আর আবূ হানীফা বলেন, তা (নিষিদ্ধ) অঙ্গহানি করণের অন্তর্ভুক্ত!'

ঐ লোকটি রায়-ওয়ালা ছিল। সে বলল, কিন্তু ইবরাহীম নাখ্য়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, '(ঐ ধরনের) চিহ্ন দেওয়া অঙ্গহানি করার পর্যায়ভুক্ত।'

এ কথা শোনার পর দেখলাম, অকী' চরমভাবে রেগে উঠলেন। বললেন, আমি তোমাকে বলছি, 'আল্লাহর রসূল ﷺ করেছেন। আর তুমি বলছ, ইবরাহীম বলেছেন! তুমি এর উপযুক্ত যে, তোমাকে ততদিন পর্যন্ত জেলে বন্দী রাখা হবে; যতদিন না তুমি তোমার ঐ কথা প্রত্যাহার করে নিয়েছ।' *(তিরমিযী ৩/২৫০)*

অনেকে হাদীস শুনে তার অর্থ জ্ঞানে না ধরলে তা নিয়ে ব্যঙ্গ করে। এই ব্যঙ্গকারীর বিরুদ্ধেও চুপ থাকেননি সলফগণ।

আবূ মুআবিয়া যারীর (অন্ধ) এক সময় বাদশা হারূন রশীদের কাছে "একদা আদম ও মূসা আপোসে তর্কাতর্কি করলেন" -এই হাদীস বয়ান করলেন। তা শুনে কুরাইশ বংশের একজন গণ্যমান্য ভদ্রলোক বলে উঠল, 'কিন্তু মূসার সাথে আদমের দেখা হল কোথায়?'

তার এ কথায় বাদশা হারূন ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, 'বাড়াবাড়ি করলে তরবারি আছে। নাস্তিক, হাদীসে খোঁটা দিচ্ছে!'

তা দেখে আবূ মুআবিয়া তাঁকে প্রকৃতস্থ করতে লাগলেন এবং বললেন, 'ফালতু কথা বলেছে, হে আমীরুল মুমেনীন! ও বুঝতে পারেনি।'

পরিশেষে তিনি শান্ত ও প্রকৃতস্থ হলেন। *(তারীখে বাগদাদ ১৪/৭, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' ৯/২৮৮)*

মুআযাহ নামক এক মহিলা হযরত আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার যে, ঋতুমতী মহিলা রোযা কাযা করবে অথচ নামায কাযা করবে না?'

মহিলাটির প্রশ্নতে বাহ্য-দৃষ্টিতে এক প্রকার গোঁড়ামি বা আপত্তি ও প্রতিবাদমূলক প্রহসন ছিল। আর তার জন্যই মা আয়েশা (রাঃ) প্রত্যুত্তরে বললেন, 'তুমি কি (ইরাকের) হারুরার (খাওয়ারেজপন্থী) মহিলা?' মহিলাটি বলল, না, আমি তা নই। আমি জিজ্ঞাসা করে (কারণ) জানতে চাই।' মা আয়েশা (রাঃ) বললেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে থেকে আমাদের মাসিক হত। আমরা (তাঁর তরফ থেকে) রোযা কাযা করতে আদিষ্ট হতাম এবং নামায কাযা করতে আদিষ্ট হতাম না।' *(বুখারী, মুসলিম ৩৩৫নং, প্রমুখ)*

এই হল একজন মুমিনের বিশ্বাস ও জওয়াব। শরীয়তের কোন বিধানে যুক্তি বা কারণ তার কাছে অবিদিত থাকলেও বিনা কৈফিয়ত ও আপত্তিতে ঘাড় পেতে মেনে নেয়। যেমন অনেকে প্রশ্ন করে যে, দাড়ি কেন রাখতে হয়? মুমিনের জবাব হল, যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে রাখতে আদেশ করেছেন।

প্রত্যেক 'এটা কেন - ওটা কেন?'-এর ঐ একই উত্তর। অবশ্য যদি তার কোন হিকমত ও যুক্তি মুমিনের কাছে প্রকাশ পায়, তাহলে তা তো অতিরিক্ত একীনের ব্যাপার।

মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটার উপর অন্যটাকে অনুমান ও কিয়াস করে। কিন্তু শরীয়তের ব্যাপার আসলে তা নয়। যেটা যেমনভাবে এসেছে, সেটাকে ঠিক সেইভাবে বিশ্বাস করতে ও পালন করতে হবে। এটা এমন হল অথচ ওটা এমন হবে না কেন? এ 'কেন'র জবাব নেই। জুমআর খুতবা নামাযের আগে অথচ ঈদের খুতবা নামাযের পরে কেন? কুনূতে হাত তুলে জামাআতী দুআ বিধেয় অথচ ফরয নামাযের পরে তা নয় কেন? পঞ্চাশ টাকা পরিমাণের পাঁচ কেজি চাল দিয়ে যদি ষাট টাকা নেওয়া হালাল হয়, তাহলে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ষাট টাকা নেওয়া হারাম হবে কেন? কেন? কেন?

কিন্তু স্বাভাবিক হলেও শরীয়তে সে অনুমিতির কোন যৌক্তিকতা নেই। আর শুধু শরীয়তই নয়; ভাষাবিদকে জিজ্ঞাসা করেন, B-U-T বাট উচ্চারণ হয়, কিন্তু P-U-T পুট উচ্চারণ হয় কেন? কাঠের গুঁজি কাঁঠালের মুখে পিটালে কাঁঠাল পাকে। তা বলে ঐ করে তরমুজ পাকে না, বরং পঁচে যায় কেন? কোন

ফলের ভিতরের অংশ ভোগ্য এবং বাহিরের অংশ ত্যাজ্য অথচ অন্য ফলের এর বিপরীত কেন?

এই শ্রেণীর ভিন্নতা যেমন আমরা মানতে বাধ্য, তেমনি শরীয়তের আহকাম 'কেন' প্রশ্নের উত্তর না পেয়েও মানতে বাধ্য হব না কেন?

একদা রবীআহ সাঈদ বিন মুসাইয়েবকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহিলার আঙ্গুলের দিয়াত কত? (কেউ তার আঙ্গুল নষ্ট করে দিলে, তার অর্থদন্ড বা জরিমানা কত?)' উত্তরে সাঈদ বললেন, 'দশটি উঁট।' রবীআহ বললেন, 'দুটি আঙ্গুলে কত?' সাঈদ বললেন, 'বিশটি উঁট।' রবীআহ বললেন, 'তিনটি আঙ্গুলে কত?' সাঈদ বললেন, 'ত্রিশটি উঁট।' রবীআহ বললেন, 'চারটি আঙ্গুলে কত?' সাঈদ বললেন, 'বিশটি উঁট।' রবীআহ বললেন, 'যখন তার ক্ষত বেড়ে যাবে এবং বিপদ ও কষ্ট কঠিনতর হবে, তখন তার দিয়াত কম হয়ে যাবে?'

যেহেতু এ কথায় বাহ্যতঃ এক প্রকার আপত্তি ও প্রতিবাদ ছিল। তাই সাঈদ বললেন, 'তুমি কি ইরাকী নাকি?'

উত্তরে রবীআহ বললেন, '(জী না।) বরং আমি এমন একজন আলেম, যে সুনিশ্চিত হতে চায় অথবা এমন জাহেল, যে শিখতে ও জানতে চায়।'

সাঈদ বললেন, 'ভাইপো! এটাই হল সুন্নাহ।' *(বাইহাক্বী ৮/৯৬)*

অনেক সময় অনেক সুন্নাহকে নিজের বিবেক-বিরোধী মনে হয়। আসলে মানুষের সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধি সে সুন্নাহর নিগূঢ় তত্ত্বের অতল গভীরে পৌঁছতে সক্ষম হয় না। তাই মনে করে এটা হয়তো সুন্নাহ বা রাসূল ﷺ-এর হাদীস নয়। অথবা সেই সুন্নাহকে গুরুত্বহীন ভেবে বসে। আর জানতে অজান্তে সে আসলে হাদীস বিরোধী বা সুন্নাহ অমান্যকারী হয়ে যায়।

ঐ দেখুন না, যারা জানে যে, তাহিয়্যাতুল মাসজিদ সুন্নত এবং জুমআর খুতবা শোনা ওয়াজেব, তারা জুমআর খুতবা চলা অবস্থায় মসজিদে এলে আর ঐ নামায পড়ে না। জ্ঞানের উপর ভরসা করে মহানবী ﷺ-এর আদেশ লঙ্ঘন করে। তিনি বলেন, "তোমাদের কেউ মসজিদ প্রবেশ করলে সে যেন দু'

রাকআত নামায পড়ার পূর্বে না বসে।” *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭০৪নং)*

একদা খুতবা চলাকালে এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে বসে পড়লে তিনি তাকে বললেন, “তুমি নামায পড়েছ কি?” লোকটা বলল, না। তিনি বললেন, “ওঠ এবং হাল্কা করে ২ রাকআত পড়ে নাও।” *(বুখারী ৯৩০, মুসলিম, আবূ দাঊদ ১১১৫-১১১৬, তিরমিযী ৫১০নং)* অতঃপর তিনি সকলের জন্য চিরস্থায়ী একটি বিধান দেওয়ার উদ্দেশ্যে লোকেদেরকে সম্বোধন করে বললেন, “তোমাদের কেউ যখন ইমামের খুতবা দেওয়া কালীন সময়ে উপস্থিত হয়, সে যেন (সংক্ষেপে) দুই রাকআত নামায পড়ে নেয়।” *(বুখারী ১১৭০, মুসলিম ৮৭৫, আবূ দাঊদ ১১১৭নং)*

একদা হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ মসজিদ প্রবেশ করলেন। তখন মারওয়ান খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি নামায পড়তে শুরু করলে প্রহরীরা তাঁকে বসতে আদেশ করল। কিন্তু তিনি তাদের কথা না শুনেই নামায শেষ করলেন। নামায শেষে লোকেরা তাকে বলল, আল্লাহ আপনাকে রহম করুন। এক্ষনি ওরা যে আপনার অপমান করত। উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি সে নামায ছাড়ব কেন, যে নামায পড়তে নবী ﷺ-কে আদেশ করতে দেখেছি।' *(তিরমিযী ৫১১নং)*

আজও সহীহ হাদীসকে জ্ঞান ও বিবেকের নিকষে রদ করার মত বহু তথাকথিত চিন্তাবিদ ও মুজাদ্দেদ মজুদ রয়েছেন অথবা তাঁদের লিখিত বই-পুস্তক রয়েছে। যাঁদের ঠনঠনে জ্ঞানে হাদীস বুঝতে অক্ষম হয়ে তা অস্বীকার করে বসেছেন। সুতরাং এমন চিন্তাবিদ ও মুজাদ্দেদ সম্বন্ধে আপনার ভূমিকা কি হওয়া উচিত?

ঐ দেখুন না, দাড়ি লম্বা রাখলে তিনি (আলেম হয়েও) আপনাকে ব্যঙ্গ করেন। আপনার লুঙ্গি গাঁটের অনেক উপরে উঠে থাকতে দেখে আপনার প্রতি চোখ টিপাটিপি করে, আপনার সুন্নতী চুল দেখে,(2) আপনার শরীয়তী পর্দা

() অনেক উলামার মতে লম্বা চুল রাখাটা প্রকৃতি ও স্বভাবগত সুন্নত। অর্থাৎ, এ সুন্নতে মহানবী ﷺ-এর হেদায়াত বা ইবাদতগত ইচ্ছা ছিল না। যেমন নির্দিষ্ট ধরনের খাবার বা রং পছন্দ ইত্যাদি। তবুও বহু সলফ সে সুন্নতও পালন করে গেছেন। সওয়াবের নিয়তে তা পালন

পালন করা দেখে, আপনার হারাম থেকে দূরে থাকা দেখে, তিনি বা তাঁরা টিস মারেন, উপহাস করেন। যেন আপনি হাদীস বুঝেন না অথবা তিনি হাদীস মানেন না। এমন যালেম আলেমের বিরুদ্ধে আপনার কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত?

ঐ দেখুন না, মযহাবের বরাতে উনি কত সহীহ হাদীস বর্জন করে চলেছেন। সহীহ হাদীসের উপর আমল করতে চান না, শুধু এই জন্য যে, তা তাঁর মযহাব-বিরোধী। অথচ যাঁর নামে মযহাবের নাম তিনি স্বয়ং বলে গেছেন, 'হাদীস সহীহ হলে, সেটাই আমার মযহাব।' সুতরাং উনার ব্যাপারে আপনার কর্তব্য কি হওয়া উচিত?

সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করুন। সুন্নাহ-বিরোধীকে নসীহত করুন, বর্জন করুন। সুন্নাহ চলে গেলে দ্বীনের অনেক অংশই চলে যাবে। আব্দুল্লাহ বিন দায়লামী বলেন, 'আমার নিকট এ খবর পৌঁছেছে যে, দ্বীন যাওয়ার প্রথম ধাপ হল, সুন্নাহ চলে যাওয়া। একটির পর একটি সুন্নাহ চলে গিয়ে দ্বীন চলে যাবে। যেমন একটির পর একটি খি যেতে যেতে রশি নষ্ট হয়ে যায়।' *(দারেমী ১/৫৮, লালকাঈ ১/৯৩)*

প্রকৃত মুসলিম হল সেই, যে তার জীবনের প্রতিটি কর্মকে কিতাব ও সুন্নাহর কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেয়, ওজন করে সকল ভূমিকাকে কিতাব ও সুন্নাহর নিক্তিতে। তা না হলে সে প্রকৃত মুসলিম হতে পারে না।

জ্ঞানী মুসলিম তো সেই ব্যক্তি, যে নিজে সকল সুন্নাহর উপর আমল করতে না পারলেও পরের আমল করা দেখে তার গা জ্বলে না, তার প্রতি বিদ্রূপের তীর ছুঁড়ে না। যেহেতু দ্বীনের কোন অংশ নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা বড় বিপজ্জনক ব্যাপার।

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল অহহাব (রঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ-

---

করলে, তাতে সওয়াব আছে এবং যে পালন করবে, তার উপর তাদের কোন আপত্তি থাকার কথা নয়, যারা তা পালন করা বিধেয় নয় মনে করে।

এর আনীত কোন বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে সে কাফের হয়ে যাবে।'

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ۝٨ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۝٩ ﴾

অর্থাৎ, যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। সুতরাং আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিবেন। *(সূরা মুহাম্মাদ ৮-৯ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর দ্বীনের কোন অংশ নিয়ে, আল্লাহর কোন সওয়াব বা শাস্তি নিয়ে উপহাস করবে, সেও কাফের হয়ে যাবে। আর এ কথার দলীল হল, মহান আল্লাহর এই বাণী; তিনি বলেন,

﴿ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ۝٦٥ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ (-)

অর্থাৎ, বল, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাঁর রসূল নিয়ে উপহাস করছিলে? তোমরা এখন (খোঁড়া) ওযর দেখিও না, তোমরা তো ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গেছ। *(সূরা তাওবাহ ৬৫-৬৬ আয়াত)*

সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল অহহাব বলেন, উলামাগণ এ বিষয়ে একমত যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রসূল অথবা তাঁর দ্বীন নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করবে, সে কাফের হয়ে যাবে; যদিও সে ব্যক্তি মজাকছলে বলে এবং আসল উপহাস তার উদ্দেশ্য না থাকে। *(তাইসীরুল আযীযিল হামীদ ৬১৭পৃঃ)*

বলাই বাহুল্য যে, এমন মজলিসে বসবেন না, যে মজলিসে আল্লাহর দ্বীনের কোন অংশ বা রসূল ﷺ-এর কোন সুন্নত নিয়ে উপহাস-ব্যঙ্গ করা হয়। এমন আলেমের বা লোকের সাহচর্য গ্রহণ করবেন না, যে ঐরূপ বিদ্রূপ করে থাকে।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝٦٨ ﴾

অর্থাৎ, (হে নবী) তুমি যখন দেখ যে, তারা আমার নিদর্শন সম্বন্ধে নিরর্থক আলোচনায় মগ্ন হয়, তখন তুমি দূরে সরে পড়বে; যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্তি হয় এবং শয়তান যদি তোমাকে ভ্রমে ফেলে, তাহলে স্মরণ হওয়ার পরে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না। *(সূরা আনআম ৬৮ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۝١٤٠ ﴾

অর্থাৎ, আর তিনি কিতাবে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন যে যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর কোন আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত না হয় তোমরা তাদের সহিত বসো না, নচেৎ তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। কপট ও অবিশ্বাসীদের সকলকেই আল্লাহ জাহান্নামে একত্রিত করবেন। *(সূরা নিসা ১৪০ আয়াত)*

অতএব এমন লোকদেরকে নসীহত করুন। না পারলে তাদের সঙ্গ বর্জন করুন। জীবনে চলার পথে সুন্নাহর আলো দিয়ে আপনার পথ আলোকিত করুন। নিজের ত্রুটি জানার জন্য সুন্নাহর আয়না ব্যবহার করুন। মনের ময়লা দূর করার জন্য সুন্নাহর সাবান ব্যবহার করুন। সুন্নাহ গ্রহণ করার জন্য আপনার হৃদয়-মন উদার ও প্রশস্ত হোক - এই কামনা করি।

সুন্নাহ অগ্রাহ্য করার তড়িৎ-শাস্তি

আল্লাহর রসূলের সুন্নাহ নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করলে, সুন্নাহর যথার্থ কদর না করলে, তার শাস্তি তো পরকালে আছেই। ইহকালে সত্বর শাস্তিও কোন কোন মানুষকে মহান আল্লাহ প্রদান করে থাকেন। তাঁর প্রিয় হাবীবের কথাকে অগ্রাহ্য করার পরিণামে কিছু সাজা দিয়ে থাকেন ঐ উন্নাসিক, উদ্ধত ও ব্যঙ্গকারীকে। এ মর্মে কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ ঃ-

১। ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা নবী ﷺ বললেন, "(সফর থেকে ফিরে) তোমরা রাতের বেলায় স্ত্রীদের কাছে গমন করো না।"

কিন্তু দুটি লোক হাদীসটিকে হাল্কা মনে করল; ভাবল, রাতে নিজের স্ত্রীর কাছে গেলে কি আর হবে? ফলে মহানবী ﷺ-এর নির্দেশকে তাচ্ছিল্য করল। আল্লাহর রসূল ﷺ যখন সফর থেকে ফিরে এলেন, তখন ঐ দুই ব্যক্তি তাঁর আদেশ অমান্য করে নিজ নিজ স্ত্রীর কাছে গমন করল। হাদীস তাচ্ছিল্য করার তড়িৎ-শাস্তি স্বরূপ প্রত্যেকেই দেখতে পেল, প্রত্যেকের স্ত্রীর কাছে অপর পুরুষ শয়ন করে আছে! *(দারেমী ৪৪৪নং)*

২। সালামাহ বিন আকওয়া' বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট বাম হাত দ্বারা কিছু খাচ্ছিল। তা দেখে তিনি তাকে বললেন, "তুমি তোমার ডান হাত দ্বারা খাও।" কিন্তু সে বলল, 'আমি পারি না।' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "তুমি যেন না পার। অহংকারই ওকে (এ নির্দেশ মানতে) বাধা দিয়েছে।" সালামাহ বলেন, সুতরাং সে আর কোনদিন তার ডান হাতকে তার মুখের কাছে তুলতে পারেনি। *(মুসলিম ২০২১নং)*

৩। হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "একদা (পূর্ববর্তী উম্মতের) এক ব্যক্তি একজোড়া পোশাক পরে, গর্বভরে, (মাথা আঁচড়ে) অহংকারের সহিত চলা-ফেরা করছিল। ইত্যবসরে আল্লাহ তার (পায়ের নীচের মাটিকে) ধসিয়ে দিলেন। সুতরাং সে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত

মাটির গভীরে নেমে যেতেই থাকবে।" *(বুখারী ৫৭৮৯, মুসলিম ২০৮৮নং)*

এক যুবক উপর-নিচে একই শ্রেণীর নতুন ও সুন্দর পোশাক পরে ছিল। সে এই হাদীস শুনে ব্যঙ্গ করে আবূ হুরাইরার উদ্দেশ্যে বলল, 'হে আবূ হুরাইরা! সেই যুবক যাকে ধসিয়ে দেওয়া হয়েছে, সে বোধ হয় এমনি করে চলছিল?' অতঃপর (চলা দেখাতে দেখাতে) সে তার হাতে থাপড় মারল। আর সাথে সাথে সে এমনভাবে পড়ে গেল, যাতে তার (পা) ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। আবূ হুরাইরা বললেন, 'তোমার নাক-মুখ ভূলুণ্ঠিত হোক। (মহান আল্লাহ বলেন,)

﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴾ ( ) ( )

অর্থাৎ, বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আমিই তোমার জন্য যথেষ্ট।' *(সূরা হিজর ৯৫ আয়াত) (দারেমী ১/১২৭)*

৪। আব্দুর রহমান বিন হারমালাহ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি হজ্জ অথবা উমরায় যাওয়ার পূর্বে বিদায় জানাতে (আযানের পর মসজিদে) সাঈদ বিন মুসাইয়েবের নিকট এল। তিনি লোকটিকে বললেন, 'নামায না পড়ে যেও না। কারণ, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আযানের পর মসজিদ থেকে মুনাফিক ছাড়া অন্য কেউ বের হয় না। তবে সে ব্যক্তি বের হতে পারে, যার প্রয়োজন আছে এবং পুনঃ ফিরে আসার ইচ্ছা রাখে।" কিন্তু সে বলল, 'আমার সঙ্গীরা এখন হার্রাতে আছে। (আর তারা আমার অপেক্ষা করছে।)' অতএব (সে এ হাদীস অমান্য করেই মসজিদ থেকে) বের হয়ে গেল। সাঈদ তার কথা নিয়ে ব্যাকুল ছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি খবর পেলেন যে, সে লোক নিজ সওয়ারী হতে পড়ে গেছে এবং তাতে তার উরুর হাড় ভেঙ্গে গেছে। *(দারেমী ৪৪৬নং)*

৫। আবূ ইয়াহয়া সাজী বলেন, একদা আমরা বসরার গলিতে কোন মুহাদ্দিসের বাসার দিকে যাচ্ছিলাম। আমি তাড়াতাড়ি চলতে শুরু করলাম। আমাদের মধ্যে একজন লোক ছিল; সে (ব্যঙ্গ করে) বলে উঠল, 'তোমরা নিজেদের পা ফিরিশ্তার ডানা থেকে তুলে নাও; ডানা ভেঙ্গে দিও না।' যেই বলা,

সেই তার পা সেখানেই শুষ্ক হয়ে গেল এবং সেখানেই সে পড়ে গেল। *(বুস্তানুল আরেফীন, নওবী ৯২পৃঃ)*

৬। কাযী আবুত্ ত্বাইয়েব বলেন, একদা জামেউল মানসূরে আমরা বিচার মজলিসে বসে ছিলাম। এমন সময় এক খুরাসানী হানাফী যুবক সেখানে উপস্থিত হয়ে গাই-এর স্তনে দুধ জমিয়ে রেখে (দুধের পরিমাণ বেশী দেখিয়ে গাই) বিক্রয় করার বিষয়ে মাসআলা জিজ্ঞাসা করে দলীল চাইল। দলীল স্বরূপ আবূ হুরাইরার হাদীস পেশ করা হলে সে বলল, 'আবূ হুরাইরার হাদীস মকবূল নয়। কারণ--- (তিনি ফকীহ নন।)' তার কথা বলা তখনো শেষ হয়নি, এমন সময় একটি বিরাট আকারের সাপ মসজিদের ছাদ থেকে তার উপরে পড়ল। লোকেরা তা দেখে লাফিয়ে উঠে পড়ল। যুবকটি তা দেখে পালাতে শুরু করল এবং সাপটিও তার পিছনে ছুটতে লাগল। তাকে বলা হল, 'তুমি তওবা করে নাও, তওবা করে নাও।' সে তৎক্ষণাৎ বলল, 'আমি তওবা করলাম।' ইত্যবসরে সাপটি অদৃশ্য হয়ে গেল। তার কোন চিহ্নই দেখা গেল না। *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' ২/৬১৮)*

অবশ্য এর মানে এই নয় যে, যে কেউ এইভাবে সুন্নাহর বিরুদ্ধে নাক সিঁটকাবে অথবা সুন্নাহ নিয়ে ব্যঙ্গ করবে অথবা সুন্নাহ অমান্য করবে তাকেই কারেন্ট্ শাস্তি দেওয়া হবে। বরং আল্লাহর ইচ্ছা হলে সে এই শাস্তি সাথে সাথে অথবা কিছু পরে দুনিয়াতে পাবে, নচেৎ আখেরাতে তো আছেই।

হাদীস না মানার জাহেলী অজুহাত

সহীহ হাদীস, সহীহ হাদীস। কৈ সনদসহ একটা হাদীস মুখস্থ শুনান তো দেখি?

সনদসহ যদি কোন আলেম একটি হাদীস শুনাতে না-ই পারেন, তাহলে কি আপনি সহীহ হাদীস মানবেন না?

সোনা কি করে তৈরী হয়, তা যদি বলতে না-ই পারি, তাহলে কি আপনি

সোনাকে সোনা বলে মানবেন না?

উচ্চ বংশের মানুষ যদি তার বংশ-নামা মুখস্থ না-ই রাখে, তাহলে কি আপনি তার বংশে সন্দেহ করবেন?

আর আমি যদি সনদসহ একটি হাদীস মুখস্থ শুনিয়েই দিই, তাহলে কি আমি যে হাদীসটাকে সহীহ বলব সেটাকেই সহীহ বলে মেনে নেবেন?

আসলে সহীহ হাদীস অস্বীকার করার এটি একটি বিজয়ী বুদ্ধি। এমন কৌশল তো আল্লাহর কাছে চলবে না ভাই।

অনেক জায়গায় প্রচলিত থাকে জাল অথবা যয়ীফ হাদীস। যখনই আপনি সেখানে সহীহ হাদীস বলবেন, তখনই লোকেরা সোচ্চার হয়ে বলবে, 'এ আবার নতুন হাদীস কোত্থেকে এল?'

অথচ হাদীস তো আমার-আপনার কথা নয়। হাদীস তো মহানবী ﷺ-এর অমীয় বাণী। তা তো ১৪০০ বছরের পুরাতনই। কিন্তু লোকমাঝে তার প্রচার না থাকার কারণে, যখনই প্রথম শোনে তখনই তারা তা নতুন মনে করে। আসলে হাদীস নতুন নয়, নতুন হল আমাদের জানা।

আর যারা বলে, 'এটা নতুন হাদীস' - আসলে তারা কি মহানবী ﷺ-এর সকল হাদীস শুনে ফেলেছে? তা না হলে কি করে নাক সিঁটকিয়ে 'নতুন হাদীস' বলতে সাহস করে?

আসলে এটিও একটি আজীব ধরনের হাদীস অমান্য করার পেঁচালো বুদ্ধি। তাছাড়া তা হল অজ্ঞতার বিশেষ পরিচয়।

অনেকে বলে, 'অমুক জাঁদরেল আলেম ছিলেন। এ রকম হাদীস তিনি কৈ শুনিয়ে যাননি। তিনি কি এ হাদীস জানতেন না?'

যদি বলি 'জানতেন না' তাহলে তাতে ক্ষতি কি? তাতে কি তাঁর সম্মানে লাগবে? তিনি কি সবজান্তা ছিলেন? আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাহাবাগণ কি সব হাদীস জানতেন?

অনেকে বলবে, 'তাহলে আপনিই কি সবজান্তা নাকি? আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাহাবাগণ জানলেন না, অমুক সাহেব জানলেন না, আর আপনি জানলেন

কি করে? আপনি কি সাহাবা থেকেও বড় নাকি?'

না ভাই! তা তো কেউ হতে পারে না। যে জিনিস বাপের যুগে ছিল না বা যা তার অজানা ছিল, তা যদি বেটা জেনে ফেলে, তাহলে কি বেটা বাপ থেকে বড় হয়ে যায়? আসলে যত দিন যায়, গবেষণা তত গভীর হতে থাকে। সহীহ-যয়ীফের তমীয তত সূক্ষ্ম ও নিপুণ হতে থাকে। আগে তত হাদীস-গ্রন্থ ছিল না, ছিল না ছোট্ট একটা ডিস্কের ভিতরে হাজার হাজার কিতাব রাখার ব্যবস্থা। আগে একটি হাদীস খুঁজতে পুরো দিন বা কয়েক দিন ব্যয় হতো, কিন্তু এখন তো এক মিনিট বা কয়েক সেকেন্ডে সে হাদীস খুঁজে পাওয়া যায়। তাহলে কি এ কথা মানতে চান না?

যুগের সাথে সাথে যুগের মানুষের পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবর্তন ঘটেছে যান্ত্রিক যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি। যান্ত্রিক উন্নতির সাথে সাথে উপকার হয়েছে দ্বীন ও দ্বীনদারের। কাফেররা আবিষ্কার করলেও সে আবিষ্কার দ্বারা উপকৃত হচ্ছে মুমিন মানুষ। কোন মুসলিম না-ই বা পারল তা আবিষ্কার করতে? মুমিনের জন্য তো আসমান-যমীনের সব কিছুকেই তাবেদার করা হয়েছে। অতএব কাফের সেই তাবেদারী করে নিত্য-নতুন জিনিস আবিষ্কার করুক। আর মুমিন সহজ উপায়ে তা ব্যবহার করুক। এগুলি আল্লাহর তরফ থেকে মুমিনের বিনা মেহনতের এক একটি উপহার। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই।

পক্ষান্তরে এমনও হতে পারে যে, অমুক জাঁদরেল সাহেব ঐ হাদীস জানতেন, কিন্তু স্বার্থের খাতিরে অথবা অন্য কোন মনে করা সহীহ হাদীসের বিরোধী হওয়ার কারণে অথবা অন্য কোন হিকমতে সে হাদীস প্রচার করে যাননি। আর এ সব কথা অত্যুক্তি নয়। আপনি সমীক্ষা ও গবেষণা করে দেখতে পারেন।

অনেকে বলে, 'হাদীস আর হাদীস। হাদীস আর কে মানছে? মৌলবীরা-হুযুররাই হাদীস মানে না। হাদীসে কি আছে বিল্ডিং করার কথা? হাদীসে কি আছে টাকা উপার্জন করার কথা? আলেমরা এই করে কেন? মৌলানারা ঐ করে কেন?'

আসলে এ সকল কথা জাহেলরাই বলে থাকে। মুবাহ কাজ করলে অথবা আফযল ত্যাগ করলে হাদীস অমান্য করা হয় না -এ জ্ঞান তাদের নেই বলেই অনেক সময় হিংসার মুখে খামাখা চিমটি কাটে। আলেম মানুষ সর্বদা ঝুলি নিয়ে

ভিক্ষা করবে এটাই তাদের চোখে বেশ সুন্দর দেখায়। অতএব তারা বিল্ডিং করলে ওদের চোখে তো কাঁটা বিঁধবেই।

আমার এক বন্ধু একটি গল্প বলেছিলেন; তাঁর গ্রামের এক লোক কিছু লোকের মুখে এক আলেমের প্রশংসা শুনে বলেছিল, 'উ- আবার ভালো আলেম। ভালো আলেম তাতি (দুটো) বিয়ে করেছে?!'

অর্থাৎ আলেম হয়ে বৈধভাবে (দুটো) বিয়ে করাও ঐ জাহেলের কাছে খারাপ কাজ। তাই তাঁর প্রতি এত ঘিন্না!

অবশ্য বেআমল আলেম যে নেই তা বলছি না। কিন্তু তাদের কারণে কি আপনিও হাদীস মানবেন না। তাহলে যে, পরের দোষে নিজের ক্ষতি করবেন। কেউ যদি অধম হয়, তাহলে আপনি উত্তম হবেন না কেন?

হাদীস অমান্যকারীর কতিপয় সন্দেহ ও তার নিরসন

কালে কালে হাদীস অস্বীকার ও অমান্যকারীর সংখ্যা কম নয়। প্রাচীন কাল থেকেই এক শ্রেণীর মানুষের কাছে সুন্নাহর কোন কদর নেই। শিয়াদের এক সম্প্রদায় তো মুহাম্মাদ ﷺ-কে তো নবী বলে মানতেই রাযী নয়। তাদের মতে হযরত আলী ﵁-ই নাকি নবুঅতের আসল হকদার। যেমন কুরআনী নামক এক ফির্কার নিকট কুরআনই একমাত্র মান্য দলীল; হাদীস তাদের নিকট কিছুই নয়।

কেউ তো কোন কোন হাদীসকে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর উক্তি নয় বলেই অস্বীকার করে থাকে। কারণ, সে উক্তি তার সীমিত জ্ঞানের ঊর্ধ্বে তাই, তার বিবেক গ্রহণ করে না তাই!

কেউ বা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর হাদীসকে এই জন্য মান্যতা দেয় না যে, তা তার মযহাবের বরখিলাফ। হাদীস সহীহ হলেও তার নিকট যেহেতু মযহাবের অনুকরণ করা ফরয, সেহেতু সে ঐ হাদীস মানতে বাধ্য নয়। তার নিকট ঐ হাদীস হয় মনসূখ (রহিত), নচেৎ তার কোন দূর ব্যাখ্যা করা হয়! যদিও ইমাম

আবূ হানীফা প্রমুখ ইমামগণ বুখারী-মুসলিম প্রভৃতি দেখে যাননি এবং আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সমস্ত হাদীস জানতেন না। পরন্তু তাঁরা বলে গেছেন যে, 'হাদীস সহীহ হলে, সেটাই আমার মযহাব।'

ওদিকে খাওয়ারেজরা মোটামুটি হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে আহলে বায়তের ফযীলতে বর্ণিত সকল হাদীসকে অস্বীকার করে বসে। আর এদিকে শিয়ারা সাহাবার ফযীলতে বিভিন্ন হাদীসকে অমান্য করে।

মু'তাযিলা ও জাহমিয়ারা আল্লাহর সিফাতের হাদীসসমূহকে অমান্য করে।

কোন কোন ফকীহ অফকীহ সাহাবীর হাদীস গ্রহণ না করে বর্জন করে থাকেন।

আর হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে (বিংশ শতাব্দীতে) পশ্চিমা বিশ্বের উন্নয়ন-মুগ্ধ কিছু তথাকথিত চিন্তাবিদ মহানবী ﷺ-এর কোন কোন হাদীসকে অস্বীকার করে বসেন।

যারা হাদীস মানতে চায় না, তাদের নিকট কিছু খোঁড়া যুক্তি আছে; যা নবীভক্ত মানুষের কাছে প্রকাশ ও খন্ডন হওয়া দরকার। নচেৎ তাদের খপ্পড়ে সেও এসে যেতে পারে। তাদের কতিপয় যুক্তি নিম্নরূপ ঃ-

(১) মহান আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ ﴾

অর্থাৎ, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ (নেয়ামত) সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্মরূপে মনোনীত করলাম। *(সূরা মায়েদাহ ৩ আয়াত)*

অতএব কুরআন দ্বারাই আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। সুতরাং হাদীসের দরকার কি?

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ﴾ (   )

অর্থাৎ, আমি তোমার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে রয়েছে প্রত্যেক জিনিসের বয়ান। *(সূরা নাহল ৮৯ আয়াত)*

সুতরাং কুরআনেই যদি প্রত্যেক জিনিসের বয়ান থাকে, তাহলে হাদীসের প্রয়োজন কি?

এমন সংকীর্ণ দৃষ্টি-ভঙ্গির মানুষের প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, কেবল কুরআন দ্বারাই দ্বীন পরিপূর্ণ নয়। তা হলে মহান আল্লাহ নিজ আনুগত্যের সাথে সাথে তাঁর রসূলের আনুগত্য করতে মুসলিমদেরকে আদেশ দিতেন না। আসলে তিনি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা নিজ দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন।

কুরআনে প্রত্যেক জিনিসের বর্ণনা থাকলেও বিস্তারিত বর্ণনা নেই। যেমন নামায পড়া, যাকাত দেওয়া ও হজ্জ ইত্যাদি করার আদেশ কুরআনে থাকলেও তার সময়, পদ্ধতি, পরিমাণ ইত্যাদির কথা কুরআনে নেই। বলা বাহুল্য, তা জানতে আমাদেরকে হাদীসের অনুসরণ করতে হবে।

পরন্তু হাদীস হল কুরআনের ব্যাখ্যা। সে ব্যাখ্যা না নিলে অনেক সময় কুরআন বুঝতেও পারা যায় না।

মোট কথা কুরআনে আছে সকল জিনিসের বয়ান; কিন্তু কিছু বয়ান আছে বিস্তারিত। আর কিছু আছে অবিস্তারিত। এই অবিস্তারিত বয়ান বিস্তারিতভাবে জানার জন্য সুন্নাহর বয়ান চাই। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾ ﴾

অর্থাৎ, আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মানুষের জন্য তাদের প্রতি অবতীর্ণ জিনিসকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দাও, আর যাতে ওরা চিন্তা করে। *(সূরা নাহল ৪৪ আয়াত)*

(২) মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِى ٱلْكِتَٰبِ مِن شَيْءٍ ۚ ﴾ (   )

অর্থাৎ, আমি কিতাবে কোন কিছুই লিপিবদ্ধ করতে ছাড়িনি। *(সূরা আনআম*

৩৮ আয়াত) সুতরাং সবকিছুই তো কুরআনে মজুদ। তবে হাদীসের কি দরকার?

আসলে উক্ত আয়াতে 'কিতাব' বলে 'লওহে মাহফূয'কে বুঝানো হয়েছে। যে কিতাবে সকল সৃষ্টির ইল্‌ম লিপিবদ্ধ আছে। এখানে কিতাব বলে কুরআন উদ্দেশ্য নয়।

(৩) মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ ۝٩ ﴾ (   )

অর্থাৎ, আমিই যিক্‌র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি। আর আমিই তার হিফাযত করব। *(সূরা হিজ্‌র ৯ আয়াত)*

বলা বাহুল্য, মহান আল্লাহ কেবল কুরআনকেই বিকৃতি ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা ও হিফাযত করার দায়িত্ব নিয়েছেন; হাদীসকে নয়। অতএব হাদীস অবিকৃত অবস্থায় আছে কি না, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আর যার অবিকৃতিতে কোন নিশ্চয়তা নেই, তা মানা যায় কি করে?

উত্তরে আমরা বলব যে, মহান আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীন দান করেছেন এবং সে দ্বীনকে কায়েম রাখতে আমাদেরকে আদেশ করেছেন। তিনি কুরআন অবিকৃত রাখার দায়িত্ব নিয়েছেন; তেমনি সামগ্রিকভাবে দ্বীনকে বিজয়ী করার ওয়াদা দিয়েছেন। ওয়াদা দিয়েছেন, তিনি তাঁর রসূলদেরকে সাহায্য করবেন এবং তাঁর নূরকে পরিপূর্ণতা দান করবেন। তিনি বলেন,

﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَـٰفِرُونَ ۝٣٢ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ۝٣٣ ﴾ (-   )

অর্থাৎ, তারা চায় যে, আল্লাহর নূরকে নিজেদের মুখের ফুৎকার দ্বারা নির্বাপিত করে দেয়, অথচ আল্লাহ নিজ নূর (দ্বীনে ইসলাম)কে পূর্ণত্বে পৌছানো ব্যতীত নিরস্ত হবেন না; যদিও তা কাফেরদের নিকট অপ্রীতিকর। তিনিই নিজ

রাসূলকে হেদায়াত (কুরআন) ও সত্য ধর্ম সহকারে প্রেরণ করেছেন, যেন ওকে সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করে দেন; যদিও মুশরিকদের নিকট তা অপ্রীতিকর। *(সূরা তাওবাহ ৩২-৩৩ আয়াত)*

(৩) আবূ হুরাইরা বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন নিজের স্মৃতি থেকে। তাঁর যে কোন ভুল হয়নি তার নিশ্চয়তা কোথায়? তিনি এত হাদীস মুখস্থ করলেন ও রাখলেন কিভাবে?

আবূ হুরাইরা সর্বমোট ৫৩৭৪ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন নিজের স্মৃতি থেকে। এতটুক পরিমাণ কোন কথা মুখস্থ করা আশ্চর্যের কিছু নয়। কুরআন মাজীদে মোট আয়াত আছে ৬৬৬৬টি। পানির মত তা মুখস্থ শুনিয়ে দেওয়ার মুসলমান আছে হাজারে হাজার। অনেক সময় ৬/৭ বছরের শিশু মুখস্থ করে ফেলে এতগুলো আয়াত! কোন কোন দেশে ফাতহুল বারীর মত (১৩ খন্ডের) বিশাল গ্রন্থ স্মৃতিস্থ করে রাখার মত লোকের কথা শোনা যায়! বুখারী শরীফে মোট হাদীস আছে ৭৫৬৩টি। সেই বুখারী শরীফকে গোটা মুখস্থ রাখার মত লোক আছে এ দুনিয়ায়। তাহলে আবূ হুরাইরার জন্য ঐ পরিমাণ হাদীস মুখস্থ রাখা কি এমন আশ্চর্যের ব্যাপার?

পক্ষান্তরে তিনি ছিলেন নবুঅতের ইল্‌ম সঞ্চয়নে বড় আগ্রহী। খেয়ে না খেয়ে মসজিদে নববীতে পড়ে থাকতেন। হাদীস মুখস্থ রাখার ব্যস্ততায় অন্য কোন কাজও তিনি করতেন না। আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে যে খাবার আসত, সেই খাবার হতে তিনি কিছু পেলে খেতেন; নচেৎ ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বেঁধে অথবা পেটকে মাটির সাথে লাগিয়ে শুয়ে থাকতেন। সেই অবস্থায় লোকেরা তাঁকে দেখে পাগল ভাবত। দুনিয়ার কোন মায়া তাঁকে আকর্ষণ করতে পারেনি। তাঁকে আকর্ষণ করে রেখেছিল রিসালাতের সেই বচনামৃত।

মদীনার আনসারগণ নিজেদের চাষবাস নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। মক্কার মুহাজেরগণ ব্যবসা নিয়ে মগ্ন থাকতেন। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে মহানবী ﷺ-এর সভায় আসতেন, সফরে যেতেন, জিহাদে যেতেন। আর আবূ হুরাইরার কোন ব্যস্ততা ছিল না। তিনি সদা তাঁর খিদমতে পড়ে থাকতেন। যেখানে

যেতেন সেখানে তিনিও যেতেন। যে কথা শুনতেন, তা ভালোভাবে মনে রাখতেন। বিভিন্ন প্রশ্ন করেও তিনি নবুঅতের জ্ঞান অর্জন করতেন।

একদা অধিক স্মৃতিশক্তি কামনা করে মহানবী ﷺ-এর নিকট আবেদন করলেন। তিনি বললেন, তুমি তোমার চাদর বিছাও। অতঃপর তা বুকে ফিরিয়ে নাও। তিনি তাই করলে নবুঅতের এক মু'জেযা স্বরূপ তারপর থেকে আর কোন হাদীস শোনার পর ভুলতেন না। *(বুখারী, মুসলিম ২৪৯২নং, নাসাঈ)*

এর পরেও কি কোন বিবেকসম্পন্ন মানুষের কাছে আবূ হুরাইরা বা অন্য কোন সাহাবীর হাদীস শুনে তা সঠিকরূপে পরবর্তী বংশধরের নিকট পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকতে পারে?

(৪) কুরআন লিখা হয়েছে সাথে সাথে; কিন্তু হাদীস লিখা হয় বহু পরে। অতএব যা এত পরে লিখা, তার অবিকৃতিতে ভরসা কোথায়?

(৫) হাদীস মান্য বা দলীল হলে মহানবী ﷺ সাহাবাদেরকে কুরআন লিখার মত তা লিখতে আদেশ দিতেন। অথচ তিনি তা দেননি। বরং তিনি হাদীস লিখতে নিষেধ করেছেন। বুঝা গেল, সুন্নাহর কোন গুরুত্ব নেই।

আসমানী অহী কুরআন সংরক্ষণ করার জন্য রসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণ বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। কুরআন অবতীর্ণ হওয়া মাত্র আল্লাহর নবী ﷺ-এর স্মৃতিস্থ হয়ে যেত। তিনি সাহাবাদেরকে শুনাতেন, মুখস্থ করাতেন। যাঁরা লিখতে জানতেন তাঁরা পাথর, কাপড় বা চামড়ায় লিখে নিতেন। যার ফলে কুরআন অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত থেকে যায়। মহানবী ﷺ-এর ইন্তিকালের পর তা একটি মাত্র সুসজ্জিত গ্রন্থাকারে উম্মার কাছে প্রকাশ লাভ করে।

পক্ষান্তরে সুন্নাহর প্রতি সে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তার কারণ নিম্নরূপ ঃ-

(ক) মহানবী ﷺ নবুঅতের পর ২৩ বছর সাহাবাদের মাঝে বেঁচে ছিলেন। আর ঐ ২৩ বছরের মধ্যে তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী, দৈনন্দিন কর্মাবলী, চরিত্র ও ব্যবহারের সকল দিক পাথর, চামড়া বা কাঠের উপর লিখে রাখা অত্যন্ত সুকঠিন ছিল।

(খ) সাহাবাগণের মাঝে সুলেখক সাহাবী গণামাত্র কয়েক জন ছিলেন এবং তাঁরা জীবনের মূল জীবন-ব্যবস্থা কুরআন লিখতে ব্যস্ত থাকায় সুন্নাহ লিখার প্রতি যত্ন দিতে সক্ষম হননি।

(গ) যেভাবে কুরআন লিখা হত, সেইভাবে সুন্নাহ বা হাদীস লিখা হলে, কুরআন ও সুন্নাহর মাঝে গোলমাল ও সংমিশ্রণ হওয়ার বড় আশঙ্কা ছিল। আর তাতে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে সন্দেহ প্রবেশ করার ভয় ছিল। আর তার জন্যই মহানবী ﷺ নিজে কুরআন ছাড়া অন্য কিছু লিখতে নিষেধও করেছিলেন। *(মুসলিম)*

অবশ্য এ নিষেধ ছিল শুরুর দিকে। পরে লিখার অনুমতি দেওয়া হয়। বিশেষ করে যাঁদের ব্যাপারে দুটি অহীর মাঝে গোলমাল সৃষ্টি করার ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না তাঁদেরকে সুন্নাহ লিখারও অনুমতি দেওয়া হয়। প্রমাণিত যে, তিনি কাউকে কাউকে সুন্নাহ লিখে দিতে আদেশও করেছেন এবং অনেক সাহাবীর কাছে অনেক সুন্নাহ লিখিত অবস্থাতেও সংরক্ষিত হয়। (প্রায় ৫২ জন সাহাবীর কাছে বহু হাদীস লিখিত অবস্থায় পাওয়া যায়।) পরবর্তীকালে কুরআন গ্রন্থাকারে সঞ্চিত হয়ে গেলে সে ভয় একেবারেই দূর হয়ে যায়। আর তারপরেই শুরু হয় সুন্নাহ লিখার তৎপরতা।

(৬) কিছু হাদীস আছে, যাতে বুঝা যায় যে, হাদীস কোন শরয়ী দলীল নয়।

কিন্তু জেনে রাখা উচিত যে, সেসব হাদীস সহীহ নয়। তাছাড়া সহীহ হাদীসেই আছে যে, সুন্নাহ হল ইসলামী শরীয়তের একটি উৎস।

মহানবী ﷺ বলেন, "আমি যেন তোমাদের মধ্যে কাউকে এমন না পাই যে, সে নিজ গদিতে বসে থাকা অবস্থায় আমাকে যা করতে আদেশ বা নিষেধ করা হয়েছে তার কোন কথা তার নিকট এলে সে বলে, জানি না। আমরা আল্লাহর কিতাবে যা পাই, তারই অনুসরণ করব। *(রিসালাহ, শাফেয়ী ৪০৩পৃঃ)*

খাইবারের দিন আল্লাহর নবী ﷺ গৃহপালিত গাধা ও অন্যান্য অনেক জিনিসকে হারাম ঘোষণা করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, "অতি নিকটে

তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজের গদিতে বসে থাকায় অবস্থায় তাকে আমার হাদীস বর্ণনা করা হলে সে বলবে, 'আমাদের ও তোমাদের মাঝে রয়েছে আল্লাহর কিতাব। সুতরাং তাতে যা হালালরূপে পাব তাই হালাল বলে এবং তাতে যা হারামরূপে পাব তাই হারাম বলে মানব।' অথচ আল্লাহর রসূল যা হারাম করে, তা আল্লাহর হারাম করার মতই।" *(আহমাদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকেম)*

(৭) অনেক সময় দেখা যায়, একটি হাদীসকেই অনেক মুহাদ্দিস সহীহ বলেছেন, আবার অন্য অনেকেই বলেছেন, যয়ীফ। একই বর্ণনাকারীকে কেউ বলেছেন, বিশ্বস্ত, আবার অন্য কেউ বলেছেন, অবিশ্বস্ত, অনির্ভরযোগ্য। এখন আমরা কার কথাটা মেনে হাদীসটিকে সহীহ বলে মানব অথবা যয়ীফ বলে মানব না? এর থেকে কি এ কথা বুঝা যায় না যে, হাদীস নির্ভরযোগ্য ও অকাট্য দলীল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ আছে?

হাদীস সহীহ-যয়ীফ হওয়ার ব্যাপারটা অনেকাংশে নির্ভর করে তার বর্ণনাকারীর উপর। বর্ণনাকারী সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হলে হাদীস সহীহ; নচেৎ যয়ীফ। এখন বর্ণনাকারীর ব্যাপারে যদি মতভেদ থাকে তাহলে তার জন্যও মুহাদ্দিসগণ বিবেক-বিচার করে ফায়সালা গ্রহণ করে থাকেন। একজন বলেন, অমুক সহীহ এবং অপরজন বলেন, যয়ীফ। তাহলে সে ব্যক্তি যয়ীফ। যেমন অনেক লোকে ইমাম সাহেবের তারীফ করে; তিনি খুব ভালো লোক, পরহেযগার লোক ইত্যাদি। কিন্তু একজন বলল, ইমাম সাহেব মিথ্যা বলেন। তাহলে আসলে ইমাম সাহেব মিথ্যাবাদী। কারণ ভিতরকার খবর এ লোকটি জানে, আর ওরা জানে না। অতএব ইমাম সাহেব নির্ভরযোগ্য থাকলেন না।

তবে এ ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ এ কথারও খেয়াল অবশ্যই রেখে থাকেন যে, যে লোকটি বদনাম করে তার মূল্যমান কতটুক। তার অন্য কোন অসৎ উদ্দেশ্য তো নেই? তার প্রতি হিংসা তো নেই? তার কোন স্বার্থ তো নেই? ইত্যাদি।

আসলে মানার মন থাকলে এবং মানুষের ভিতরে সত্যানুসন্ধিৎসা থাকলে সত্যের নাগাল অতি সহজ। পক্ষান্তরে মনের ভিতর টেরামি থাকলে এবং না

মানার ইচ্ছা থাকলে নানা সংশয় ও সন্দেহ তথা কূট প্রশ্ন উদয় হয় হৃদয়ে।

অনেকে জ্ঞান ও বিবেকের নিকষে বহু সহীহ হাদীস রদ্দ করে থাকে। সব দিক থেকে হাদীস সহীহ হলেও কেবল তা এই বলে মানতে চায় না যে, সে কথা তার জ্ঞানে ধরে না। তার বিবেকে মনে হয়, এমন হওয়াটা অসম্ভব। আর এতে সে দাবী করে যে, তার জ্ঞান বড় নির্মল। তার বিবেক হল হক-বাতিলের পার্থক্যকারী কষ্টিপাথর।

কিন্তু আসলে এমন ব্যক্তি হল আপন খেয়াল-খুশীর পূজারী। আর কেউ তার নিজ খেয়াল-খুশী দ্বারা কোন হাদীসকে সহীহ-যয়ীফ প্রমাণ করতে পারে না। কত শত জিনিস গত ৫০ বছর আগে মানুষের জ্ঞানগম্য ছিল না, বলতে অবিশ্বাস এসে বিবেকের দরজায় ভিঁড় জমাতো। কিন্তু চোখের সামনে আজ তা বাস্তব ও সত্য। হাদীসের সত্যতা মানুষ প্রমাণ করতে পারেনি বলে সহীহ হাদীস যয়ীফ হয়ে যায় না। বরং আমাদের জ্ঞান সৃষ্টিকর্তার জ্ঞানের তুলনায় নিতান্ত মামুলী।

বলা বাহুল্য, আনুগত্যে পরিত্রাণ ও সাফল্য আছে, আর ঔদ্ধত্যে আছে সংশয় ও ধ্বংস। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমীন।

সুন্নাহ কিভাবে সংরক্ষিত হল?

মহানবী ﷺ যেখানে থাকতেন, সেখানে কোন না কোন সাহাবী থাকতেন। ঘরে-বাইরে, শহরে-সফরে, বাজারে-মসজিদে যে কোন জায়গায় কোন না কোন সাহাবী অথবা তাঁর কোন না কোন স্ত্রী তাঁর আমল লক্ষ্য করে মনে রেখেছেন, তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী মুখস্থ রেখেছেন। তাঁদের কোন সমস্যায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করে সমাধান নিতেন এবং তা মনে রাখতেন। অতঃপর তা একে অন্যকে জানাতেন ও শুনাতেন।

মহানবী ﷺ যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতেন, তখন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তিনবার করে বলতেন; যাতে সাহাবাগণ তা বুঝতে ও স্মৃতিস্থ করতে সক্ষম

হন। *(বুখারী ৯৫নং)*

তিনি সাহাবাগণকে তাঁর বাণী মুখস্থ রাখার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি বলতেন, “আল্লাহ সেই ব্যক্তির শ্রীবৃদ্ধি করেন যে ব্যক্তি আমাদের নিকট কিছু শ্রবণ করে তা অন্যের নিকট ঠিক সেই ভাবেই পৌঁছে দেয় যে ভাবে সে শ্রবণ করেছিল। কেননা যাদের কাছে (হাদীস) পৌঁছানো হয় তাদের কেউ কেউ এমনও আছে, যে ঐ শ্রবণকারী অপেক্ষা অধিক স্মৃতিমান্ ও সমঝদার।” *(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৮৩নং)*

অনেক সময় তিনি বলতেন, “তোমাদের মধ্যে উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে (এই বাণী বা ইল্‌ম) পৌঁছে দেয়। সম্ভবতঃ উপস্থিত ব্যক্তি এমন ব্যক্তির কাছে তা পৌঁছে দেবে, যে তার থেকে বেশী স্মৃতিধর।” *(বুখারী ৬৭, ১০৪, ১০৫, মুসলিম ১৬৭৯নং)*

তাঁর ইল্‌ম শিক্ষার জন্য সকলকে অনুপ্রাণিত করতেন। তিনি বলতেন, “যে ব্যক্তি এমন পথ অবলম্বন করে চলে যাতে সে ইল্‌ম (শরয়ী জ্ঞান) অন্বেষণ করে, আল্লাহ তার বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতে যাওয়ার পথ সহজ করে দেন। যখনই কোন একদল মানুষ আল্লাহর গৃহসমূহের কোন এক গৃহে (মসজিদে) সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং আপোসে তা অধ্যয়ন করে তখনই ফিরিশ্তাবর্গ তাদেরকে পরিবেষ্টিত করে নেন, তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, করুণা তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নেয় এবং তাদের কথা আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফিরিশ্তাবর্গের মধ্যে আলোচনা করেন। আর যাকে তার আমল পশ্চাদ্বর্তী করেছে তাকে তার বংশ অগ্রবর্তী করতে পারে না।” *(মুসলিম ২৬৯৯নং, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম)*

আল্লাহর রসূল ﷺ আরো বলেছেন, “যে ব্যক্তি এমন পথে চলে যাতে সে ইল্‌ম অনুসন্ধান করে, সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ জান্নাত যাওয়ার পথ সহজ করে দেন। নিঃসন্দেহে ফিরিশ্তাবর্গ ইল্‌ম অনুসন্ধানীর ঐ কর্মে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে তার জন্য তাঁদের ডানা বিছিয়ে দেন। অবশ্যই আলেমের জন্য আকাশবাসী সকলে এবং পৃথিবীর অধিবাসী -এমন কি পানির মাছ পর্যন্তও ক্ষমা

প্রার্থনা করে থাকে। আবেদ (ইবাদতকারী) অপেক্ষা আলেমের উচ্চ মর্যাদা ঠিক তদ্রূপ; যদ্রূপ সমগ্র তারকারাজি অপেক্ষা চন্দ্রের। নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীগণের ওয়ারেসীন (উত্তরাধিকারী)। নবীগণ না কোন দীনারের উত্তরাধিকার করেছেন না কোন দিরহামের। বরং তাঁরা ইলমেরই উত্তরাধিকার করে গেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করে সে পর্যাপ্ত অংশ গ্রহণ করে থাকে।” *(আবু দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ, ইবনে হিব্বান, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ৬৭নং)*

তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি কেবলমাত্র কল্যাণমূলক কিছু (দ্বীন) শিক্ষা করা অথবা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই মসজিদের প্রতি যাত্রা করে তার জন্য (তার আমলনামায়) এক পূর্ণ হজ্জের সমপরিমাণ নেকী লিপিবদ্ধ করা হয়।” *(ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৮১নং)*

তিনি আরো বলেন, “যে ব্যক্তি আমার এই মসজিদে আসে এবং তার উদ্দেশ্য কেবল কল্যাণমূলক (দ্বীনী ইল্‌ম) শিক্ষা করা অথবা দেওয়াই হয়, তাহলে সে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের মর্যাদায় সমুন্নত হয়। আর যে ব্যক্তি এ ছাড়া ভিন্ন কোন উদ্দেশ্যে আসে সে সেই ব্যক্তির সমতুল্য যে পরের আসবাব-পত্রের প্রতি তাকিয়ে থাকে।” *(ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ৮২নং)*

মহানবী ﷺ অনুপ্রাণিত করতেন অপরকে শিক্ষা দেওয়ার উপর। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি কোন ইল্‌ম শিক্ষা দেয় তার জন্য রয়েছে সেই ব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব যে সেই ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করে। এতে আমলকারীরও কিঞ্চিৎ পরিমাণ সওয়াব হ্রাস হবে না।” *(ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ৭৬নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকটে দুই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হল; একজন আবেদ, অপরজন আলেম। তিনি বললেন, “আবেদের উপর আলেমের মর্যাদা ততগুণ, যতগুণ তোমাদের কোন নিম্নমানের ব্যক্তির উপর আমার মর্যাদা রয়েছে।” অতঃপর তিনি বললেন, “নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্তাবর্গ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অধিবাসী, এমন কি পিপিলিকা নিজ গর্তে, এমন কি মৎস্য পর্যন্তও মানুষকে সৎশিক্ষাদানকারী শিক্ষকের জন্য দুআ করে থাকে।” *(তিরমিযী, সহীহ তারগীব ৭৭নং)*

সেই গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখেই মসজিদের সুফ্ফাতে অনেক সাহাবী খেয়ে-না খেয়ে ইল্ম শিক্ষার জন্য পড়ে থাকতেন।

আবূ হুরাইরা না খেয়ে পেটে পাথর বেঁধে ক্ষুধার জ্বালায় মাটির সাথে পেট লাগিয়ে পড়ে থেকেও নববী ইল্ম সংগ্রহ করার কাজে ব্যাপৃত থাকতেন। *(বুখারী, মুসলিম ২৪৯২নং, নাসাঈ)*

হযরত উমার ﷺ পালা করে নববী ইল্ম সংগ্রহ করতেন। আনসারী প্রতিবেশীর সাথে চুক্তি করে তিনি একদিন এবং আনসারী একদিন পালাক্রমে ইল্ম অর্জন করে বাড়িতে এসে একে অন্যকে শুনিয়ে দিতেন। *(বুখারী ৮৯নং)*

মহানবী ﷺ কোন কোন সময় কাউকে কাউকে লিখে নেওয়ার অনুমতিও দিয়েছেন।

তিনি তাঁর নামে মিথ্যা কোন কথা বলতে সাবধান করতেন। তিনি বলতেন, "যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছাকৃত মিথ্যা আরোপ করল, সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নাম বানিয়ে নিল।" *(বুখারী ১১০, মুসলিম ৩ নং)*

"যে ব্যক্তি আমার তরফ হতে কোন হাদীস বর্ণনা করে অথচ সে বিশ্বাস করে যে তা মিথ্যা। তবে সেও মিথ্যাবাদীদের অন্যতম।" *(সহীহ মুসলিমের ভূমিকা, প্রভৃতি)*

রিসালতের সেই আমানত পৌঁছে দিতে সাহাবাগণও আমানতদারের দায়িত্ব পালন করলেন। তাঁরাও একে-অপরকে শিক্ষা দিতে লাগলেন। শিক্ষা দিলেন পরবর্তী অনুসারী তাবেঈনদেরকে। সংগ্রহ করতে লাগলেন রসূলের হাদীস। আর তার জন্য অনেকে উঁটের পিঠে সফর করলেন দূর দেশে মাসকাল ধরে।

তাঁদের স্মৃতিশক্তি প্রখর থাকার ফলে সুন্নাহ লিখার তৎপরতা পরে শুরু হলেও বই আকারে লিখার প্রতি গুরুত্ব আরোপিত হল। কিছু সাহাবী কিছু সুন্নাহ লিপিবদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষিত করলেন। তাঁদের পর তাবেঈনগণও লিখার গুরুত্ব অনুধাবন করলেন।

রাসূল ﷺ কর্তৃক আব্দুল্লাহ বিন উমার দ্বারা লিখিত হাদীসের প্রথম কিতাব হল 'কিতাবুস স্বাদাক্বাহ'। *(আবূ দাঊদ ১৫৬৮, তিরমিযী ৬২১নং)*

বলা বাহুল্য, আব্দুল্লাহ বিন উমার হাদীস লিখে নিতেন। হাদীস লিখে

রাখতেন আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস। হাদীস লিখা হয়েছিল মুআযের জন্য এবং ইয়ামানের গভর্নর আম্র বিন হাযমের জন্য।

হযরত আবূ বাক্র, উমার ও আলী ﷺও কিছু কিছু হাদীস লিখেছিলেন। হাদীস লিখেছিলেন প্রায় ৫২ জন সাহাবী। আর সেই সকল পান্ডুলিপি তাবেঈন ও তাঁদের পরবর্তীদের মাঝে হস্তান্তর হতে থাকে। এইভাবে চলতে থাকে সুন্নাহর সংরক্ষণ।

হযরত উমার আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সুন্নাহকে একত্রে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার সংকল্প করেছিলেন। কিন্তু কুরআনের প্রতি মানুষের আগ্রহ কমে যাওয়ার আশঙ্কায় তিনি তা আর করলেন না।

পরবর্তীতে তাঁর পৌত্রী-পুত্র তাবেঈ ও পঞ্চম খলীফা উমার বিন আব্দুল আযীয (রঃ) হাদীস লিখতে আদেশ দেন। কিন্তু তখনও অধিক পরিমাণে হাদীস সঞ্চয়ন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

অতঃপর সমসাময়িক কালে সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিস ইমাম যুহরী (মৃঃ ১২৪হিঃ) খলীফা উমার বিন আব্দুল আযীযের উৎসাহদানে হাদীস লিপিবদ্ধ করার কাজে হাত লাগান। তবে তিনি সুন্নাহকে অবিন্যস্তভাবে কেবল জমা করে দেন। বুখারী-মুসলিম বা অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের মত সুবিন্যস্ত আকারে লিপিবদ্ধ করেননি।

তারপর লিখার কাজ আরো অগ্রসর হতে থাকে। মক্কায় ইবনে জুরাইজ (১৫০হিঃ), ইবনে ইসহাক (১৫১হিঃ) মদীনায় সাঈদ বিন আবী আরূবাহ (১৫৬হিঃ), রাবী' বিন সাবীহ (১৬০হিঃ), ইমাম মালেক (১৭৯হিঃ), বসরায় হাম্মাদ বিন সালামাহ (১৬৭হিঃ), কূফায় সুফিয়ান ষওরী (১৬১হিঃ), শামদেশে আবূ আম্র আওযায়ী (১৫৭হিঃ), ওয়াসেতে হুশাইম (১৭৩হিঃ), খুরাসানে আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (১৮১হিঃ), ইয়ামানে মা'মর (১৫৪হিঃ) হাদীস গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন।

অনুরূপভাবে জারীর বিন আব্দুল হামীদ (১৮৮হিঃ), সুফিয়ান বিন উ'য়াইনাহ (১৯৮হিঃ), লাইষ বিন সা'দ (১৭৫হিঃ), শো'বাহ বিন হাজ্জাজ (১৬০হিঃ) প্রায় একই যুগে হাদীসের বই লিখেন।

অতঃপর তৃতীয় শতাব্দীতে লিখিত হল হাদীসের বড় বড় মুসনাদ গ্রন্থ।

মুসনাদ লিখলেন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইসহাক বিন রাহওয়াইহ এবং গ্রন্থ রচনা করলেন উযমান বিন আবী শাইবাহ।

কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থে সহীহ-যয়ীফের তমীয না থাকার দরুন দলীল নিরূপণ করা সহজ ছিল না। প্রয়োজন ছিল যয়ীফকে বাদ দিয়ে কেবল সহীহ হাদীস লিখার। এ প্রয়োজন পূর্ণ করলেন হাদীসের আমীরুল মু'মেনীন ইমাম বুখারী (২৫৬হিঃ) এবং তাঁর ছাত্র ইমাম মুসলিম (২৬১হিঃ)।

অতঃপর তাঁদের অনুকরণে লিপিবদ্ধ হল সুনানে আরাবাআহ; আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ। তবে এ চারটি গ্রন্থ সহীর ব্যাপারে তাঁদের ঐ গ্রন্থদ্বয়ের পর্যায়ে নয়।

অতঃপর চতুর্থ শতাব্দীতে লিখা হল মাআজিম। ইমাম ত্বাবারানী (৩৬০হিঃ) কাবীর, আওসাত্ব ও সাগীর নামক তিনটি মু'জাম লিখলেন। ইমাম দারাক্বুত্বনী (৩৮৫হিঃ) লিখলেন সুনান। ইবনে হিব্বান (৩৫৪হিঃ) ও ইবনে খুযাইমাহ (৩১১হিঃ) লিখলেন সহীহ নামক গ্রন্থ। যদিও ঐ সহীহতে যয়ীফ ও জাল হাদীসও বর্তমান। তদনুরূপ গ্রন্থ রচনা করলেন ইমাম ত্বাহাবীও (৩২১হিঃ)।

আর এইভাবেই লিখা হল মুস্তাদ্রাকুল হাকেম, সুনানে বাইহাক্বী। আর বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সঞ্চয় করে লিখা হল মাজমাউয যাওয়ায়েদ প্রভৃতি গ্রন্থ।

হাদীস মানা ওয়াজেব কখন?

প্রত্যেক মুসলিমই চায় মহানবী ﷺ-এর সুন্নাহর উপর আমল করতে। কিন্তু আমলের সময় চোখ বন্ধ করে আমল বাঞ্ছনীয় নয়। হাদীসে আছে বা আল্লাহর নবী বলেছেন পড়ে বা শুনেই আমল করতে লেগে যাওয়া মুসলিমের উচিত নয়। যেমন উচিত নয়, কোন হাদীস শুনে তা অবিশ্বাস করা, তা দলীল স্বরূপ পেশ করা, নিজ গ্রন্থ বা বক্তৃতায় স্থান দেওয়া।

বলা বাহুল্য কোন হাদীসের উপর আমল করার সময় উচিত হল ঃ-

১। এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে, হাদীস হল দুটি অহীর অন্যতম।

২। হাদীসের বক্তব্যকে নির্ভুল ও নিষ্কলুষ বলে নিঃসন্দেহে মেনে নেওয়া। যেহেতু হাদীস যাঁর তিনি হলেন নির্ভুল ও নিষ্পাপ মানুষ।

৩। সেটা সত্যপক্ষে তাঁর হাদীস কি না, তা অনুসন্ধান করা ওয়াজেব। তা সহীহ কি না, তা জানা জরুরী।

৪। সহীহ প্রমাণিত হলে তা সর্বান্তঃকরণে মেনে নেওয়া ওয়াজেব; যদিও তা নিজ জ্ঞান ও বিবেকের বাইরে মনে হয় এবং তার পিছনে যুক্তি ও হিকমত না বুঝা যায়।

৫। যয়ীফ (দুর্বল), বা মওযূ' (জাল) প্রমাণিত হলে তা বর্জন করা।

৬। হাদীসের সঠিক অর্থ বুঝা। আপাতদৃষ্টিতে দুটি হাদীস পরস্পর-বিরোধী মনে হলে তা সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা করা।

৭। হাদীসের নাসেখ-মনসূখ (রহিত-অরহিত) নির্দেশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা।

উক্ত সকল নির্দেশ পালন না করলে হাদীসের উপর আমল ফলপ্রসূ নাও হতে পারে। পক্ষান্তরে প্রামাণ্য হাদীসের সঠিক বক্তব্যের প্রতি বিশ্বাস ও আমল না করলেও পরিণাম অবশ্যই মন্দ হবে।

হাদীসের গ্রন্থগুলিতে এ সব কথার উল্লেখ থাকে। উল্লেখ না থাকলে সত্যানুসন্ধানী মুহাদ্দিস আলেমের নিকট সে হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে আমল করতে হবে। আর এ কাজ সচেতন মুসলিমের জন্য মোটেই কঠিন নয়।

সব হাদীস মান্য নয় কেন?

অনেকে মনে করেন এবং বলেও থাকেন যে, রসূলের হাদীস, তার আবার সহীহ-যয়ীফ কি? রসূলের কথা কি দুর্বল হয় নাকি? তাঁর কথা জাল হয় কি করে?

এ কথা মানতেই হবে যে, গ্রহণ ও বর্জনের দিক থেকে হাদীস তিন প্রকার; সহীহ, হাসান ও যয়ীফ (দুর্বল)। এ ছাড়া রয়েছে রচিত মওযূ (জাল) হাদীস। এর মধ্যে কেবল প্রথম দুই প্রকার হাদীসকে শরীয়তের দলীল বলে মানা হয়। আকীদা, আমল ও ফাযায়েলে গ্রহণ করা হয়। বাকী শেষোক্ত দুই প্রকার হাদীসকে দলীল মানা হয় না এবং কোন ক্ষেত্রেই তা গ্রহণযোগ্য নয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাহাবীগণ - যাঁরা নিজেদের জান-মাল তাঁর জন্য কুরবানী দিয়েছেন তাঁরা - তাঁর শানে মিথ্যা বলবেন, এমন হতে পারে না। সাহাবীগণ যখন এক অপরের নিকট থেকে হাদীস শুনতেন, তখনও কেউ কাউকে অবিশ্বাস করতেন না বা বর্ণনাকারী যে মিথ্যা বলছেন তা ধারণাই করতেন না।

কিন্তু তাবেঈনদের যুগে সন ৪০ হিজরীর পরে সুন্নাহর মাঝে ভেজাল সৃষ্টি হতে শুরু হল। যখন সৃষ্টি হল রাজনৈতিক মতভেদ এবং সেই মতভেদকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ফির্কা ও দল। প্রত্যেক দল নিজের সদ্‌গুণ এবং অপর দলের বদগুণ গাইতে শুরু করল। আর তা প্রমাণের জন্য প্রত্যেকেই কুরআন ও সুন্নাহর দলীল ব্যবহার করতে লাগল। নিজ নিজ দল ও মযহাব তথা নেতাদের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা বর্ণনায় কোন দলীল না পেলে তৈরী করা হল বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন হাদীস। আর এই তৈরী করা মনগড়া হাদীসই মওযূ বা জাল হাদীস নামে প্রসিদ্ধ।

সুতরাং সে হাদীস আসলে মহানবী ﷺ-এর বাণী নয়। কিন্তু কোনও লোক হাদীস বানিয়ে তা আল্লাহর রসূলের নামে তিনি বলেছেন বলে চালিয়ে দিয়েছে। আর তা মুহাদ্দেসীনে কেরাম খুবই সতর্কতার সাথে তা পৃথক করতে সক্ষম হয়েছেন।

হাদীস জাল হওয়ার কারণসমূহ

সর্বপ্রথম ইরাকেই শিয়া সম্প্রদায় দ্বারা হাদীস জাল হতে শুরু হয়। ইমাম যুহরী বলতেন, 'আমাদের নিকট থেকে আধ হাতের হাদীস ইরাক গিয়ে এক হাত হয়ে ফিরে আসত।' ইমাম মালেক ইরাককে 'দারুয যার্ব্' (হাদীস গড়ার কারখানা) বলে অভিহিত করতেন। অবশ্য হাদীস তৈরী করার বিভিন্ন কারণ আছে। সেই কারণগুলি নিম্নরূপ ঃ-

(১) রাজনৈতিক স্বার্থপরতা ঃ

মহানবী ﷺ-এর পর তাঁর খলীফা কে? এই নিয়ে মতবিরোধকে কেন্দ্র করে

মুসলিমদের মধ্যে বিদ্বেষ-বিচ্ছেদ সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি হয় দুটি দল; শিয়া ও সুন্নী। শিয়ারা নিজেদের মতকে প্রমাণ করার জন্য তৈরী করে নানা হাদীস।

যেমন ঃ 'এই (আলী) আমার অসী, আমার ভাই এবং আমার পরবর্তী খলীফা---।'

অনুরূপ তৈরী করেছে ফাতিমা ও হাসান-হোসেনের ফযীলতে বহু হাদীস। অনেকে বলেছেন, শিয়ারা আলী ও আহলে বায়তের ফযীলতে প্রায় ৩ লাখ হাদীস রচনা করেছে!

যেমন তারা আবূ বাক্‌র, উমার, উযমান ও মুআবিয়ার বিরুদ্ধে রচনা করেছে নানা হাদীস। যেমন ঃ 'তোমরা মুআবিয়াকে আমার মিম্বরের উপরে দেখলে হত্যা করে ফেলো।'

তদনুরূপ সুন্নীরাও ইঁটের জবাব পাটকেল দিয়ে দিতে গিয়ে তৈরী করেছে অনেক হাদীস। যেমন ঃ 'জান্নাতের প্রত্যেক গাছের পাতায় পাতায় লিখা আছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আবূ বাক্‌র সিদ্দীক, উমার ফারুক ও উযমান যুন্নূরাইন।'

'বিশ্বস্ত হল তিনজন; আমি, জিবরীল ও মুআবিয়া।'

(২) ইসলামের যথাসম্ভব ক্ষতিসাধন ঃ

কিছু লোক ছিল, যারা ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রকে মেনে নিতে পারেনি; কিন্তু মুসলিম সমাজে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছে। ইসলামের প্রতি প্রকাশ্যে সরাসরি কোন মন্তব্য করতে সক্ষম না হয়ে তারা তাদের মনের বিদ্বেষ প্রকাশ করার জন্য কখনো আহলে বায়তের প্রতি মহব্বত প্রকাশ করে, কখনো সূফী সেজে, কখনো বা নিজেকে দার্শনিকরূপে যাহির করে হাদীস গড়ার পথ বেছে নিল। উদ্দেশ্য ছিল, যতটা ও যেভাবে পার মুসলিমদের ক্ষতি কর। তাই তারা ঐ হাদীসের মাধ্যমে নির্ভেজাল দ্বীনে ভেজাল অনুপ্রবেশ করাতে প্রয়াস পেল। মনের আকীদায় ভেজাল প্রবিষ্ট করতে প্রবৃত্ত হল। আর সেই সাথে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ করা হল মুসলিমদের আকীদার প্রতি। প্রমাণ করতে চাইল ইসলাম ও

মুসলিমদের বিশ্বাসের অসারতার কথা। যেমন ঃ-

'ফিরিশ্তাকে আল্লাহ নিজ হাত ও বুকের লোম থেকে সৃষ্টি করেছেন।'

'আল্লাহ প্রথমে ঘোড়া তারপর সেই ঘোড়া থেকে নিজেকে সৃষ্টি করেছেন।'

'একদা আল্লাহর চোখে অসুখ হলে ফিরিশ্তাবর্গ তাঁকে সাক্ষাৎ করে কুশল জিজ্ঞাসা করেন।'

'আল্লাহ যখন অক্ষরমালা সৃষ্টি করলেন, তখন বা সিজদা করল। আর আলিফ খাড়া থেকে গেল।'

'সুন্দর চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত ইবাদত।'

'সুন্দরীর চেহারা ও সবুজ (গাছপালার) দিকে তাকালে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়।'

'বেগুন সর্বরোগের ঔষধ।'

এইভাবে ঐ শ্রেণীর ইসলাম-বিদ্বেষীরা মুসলিমদের আকীদা, হালাল ও হারাম, চরিত্র এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানে হাজার হাজার হাদীস তৈরী করে প্রচার করেছে। বাদশা মাহদীর দরবারে এক কুচক্রী স্বীকার করে যে, সে ১০০টি হাদীস তৈরী করেছে; যা বর্তমানে লোকেদের হাতে হাতে ফিরছে!

আব্দুল কারীম আবুল আউজাকে যখন হত্যার জন্য আনা হল, তখন স্বীকার করল যে, সে ৪০০০ এমন হাদীস তৈরী করেছে; যাতে হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করা হয়েছে।

উক্ত শ্রেণীর ইসলাম-বিদ্বেষীদের কুচক্র বনী আব্বাসের খলীফাদের নিকট সুস্পষ্ট হলে, তাঁরা তাদের ঐ দূরভিসন্ধিকে হত্যার শাস্তি দিয়ে প্রতিহত করেছিলেন।

(৩) নিজ ভাষা, মযহাবী ইমাম, পেশা, দেশ, জাতি ও গোত্রের অন্ধ-পক্ষপাতিত্ব ঃ

আরব-অনারবের মাঝে ভাষা ও জাতিগত পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করতে অনারব জাহেলরা গড়েছিল বহু জাল হাদীস। যেমন ঃ- 'আল্লাহ রাগান্বিত হলে আরবী ভাষায় অহী নাযিল করেন এবং সন্তুষ্ট হলে ফারসী ভাষায় অহী

নাযিল করেন।'

তেমনি এর মোকাবিলায় আরবের জাহেলরা গড়েছিল অনুরূপ বিপরীতধর্মী হাদীস। যেমন ঃ- 'আল্লাহ রাগান্বিত হলে ফারসী ভাষায় অহী নাযিল করেন এবং সন্তুষ্ট হলে আরবী ভাষায় অহী নাযিল করেন। ' 'আরবী হল জান্নাতের ভাষা। আর ফারসী হল জাহান্নামের ভাষা।'

ইমাম আবূ হানীফার অন্ধভক্তরা তৈরী করেছে জাল হাদীস। যেমন ঃ- 'আমার উম্মতে একজন লোক হবে; যার নাম হবে আবূ হানীফা নু'মান, সে হবে আমার উম্মতের প্রদীপ। আর উম্মতে আর একজন লোক হবে; তার নাম হবে মুহাম্মাদ বিন ইদরীস (শাফেয়ী), সে আমার উম্মতের জন্য ইবলীস অপেক্ষা বেশী ক্ষতিকর হবে।'

নিজ দেশের অন্ধ-পক্ষপাতিত্ব করতে দেশভক্তরা তৈরী করেছে, 'দেশপ্রেম ঈমানের অংশবিশেষ।' এ ছাড়া দেশ ও গোত্রের নাম নিয়ে তৈরী হয়েছে আরো কত হাদীস।

পেশাগত দিক থেকে পেশাধারীরা আপোসে এক অপরের প্রতি হিংসা ও নিজের পেশা নিয়ে গর্ব করে থাকে। কেউই নিজের ঘোলকে টক বলতে রাযী নয়। নিজের পেশা যে খারাপ নয় বা সে পেশা যে ভালো তা প্রমাণ করতে জাহেলরা হাদীস থেকে দলীল পেশ করার জন্য তৈরী করেছে অনেকানেক জাল হাদীস! যেমন ঃ-

'তোমাদের সবচাইতে উত্তম ব্যবসা হল কাপড়ের ব্যবসা।'

'তোমাদের সবচাইতে ভালো ব্যবসায় হল কাপড়ের ব্যবসা। আর সবচেয়ে ভালো হাতের কাজ হল জুতো সিলায়ের কাজ।'

'তোমরা পায়জামা পর ---- হে আল্লাহ! তুমি আমার উম্মতের পায়জামা পরিধানকারিণী মহিলাদেরকে ক্ষমা করে দাও।'

(৪) বক্তার বক্তৃতা চালানোর জন্য হাদীস জাল

বক্তারা ঘন্টার পর ঘন্টা বক্তৃতা করে। ছাঁকা কথা বলতে গেলে অত সময়

ধরে বক্তৃতা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া তাদের পেশাই হল, মানুষের মন লোটা, নিমেষে কাঁদানো, নিমেষে হাসানো, মানুষের মনে চমক ধরানো, শ্রোতাকে তাক লাগিয়ে অবাক করা, মানুষের মনে নিজের একটি স্থায়ী আসন পেতে নেওয়া। আর সাধারণ মানুষও পছন্দ করে এমন ওয়ায; যাতে থাকবে ঐ শ্রেণীর আজব আজব কথা, গল্প, রূপকথা ও রসিকতা। তাতে লাভ হয় বক্তার। ডাক হয় বেশী এবং উপার্জনও। তাদের অবস্থা বলে,

'দিবানিশি পোড়া পেটের লাগিয়া,
কি না করিতেছি ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
বাণীরে বানরী করিয়া যতনে,
নাচাইয়া ফিরি ভবনে ভবনে।'

এই শ্রেণীর বক্তারা যে সকল হাদীস তৈরী করেছে তার কিছু উদাহরণ নিম্নরূপ ঃ-

'জান্নাতে মিস্ক (কস্তুরী) বা জাফরান দ্বারা সৃষ্ট এমন হূর আছে, যার পাছা হবে এক মাইল লম্বা ও এক মাইল চওড়া।'

'আল্লাহ নিজ অলীকে জান্নাতে এমন শুভ্র মুক্তানির্মিত মহল দান করবেন; যাতে থাকবে ৭০ হাজার কক্ষ, প্রত্যেক কক্ষে থাকবে ৭০ হাজার পালঙ্ক, প্রত্যেক পালঙ্কে থাকবে ৭০ হাজার হূর---।'

'বান্দা যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, তখন আল্লাহর আরশের নূরের খুঁটি হিলতে লাগে। আল্লাহ বলেন, ও খুঁটি! তুমি হিলছ কেন? থামো। খুঁটি বলে, তোমার বান্দা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলছে। সে না থামলে, আমি থামব না।'

এই ধরনের মানুষদের ঠোঁটের জোর খুব বেশী। মানুষকে বেওকুফ বানাতে পারে নিমেষে এবং থতমত না খেয়েই মিথ্যা বলতে পারে। এরা ধৃষ্টতা প্রকাশ করতে লজ্জাও পায় না। একদা রুসাফার এক মসজিদে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ও ইয়াহয়া বিন মাঈন নামায পড়লেন। নামায শেষে একজন বক্তা উঠে বক্তৃতা শুরু করল। বলতে লাগল, আমাদেরকে আহমাদ বিন হাম্বল ও ইয়াহয়া বিন মাঈন হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন

আব্দুর রায্যাক, তিনি ক্বাতাদাহ হতে এবং ক্বাতাদাহ আনাস হতে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, আল্লাহ তার বিনিময়ে প্রত্যেক শব্দের পরিবর্তে একটি করে এমন পাখী সৃষ্টি করবেন, যার ঠোঁট হবে সোনার এবং ডানা হবে প্রবালের।'

আর এইভাবে অনুরূপ প্রায় ২০ পাতার হাদীস শুনাতে লাগল। তা শুনে আহমাদ ও ইয়াহয়া একে অপরের দিকে তাকাতাকি করে জিজ্ঞাসা করে বললেন, আপনি কি এ হাদীস ওকে বর্ণনা করেছেন? বললেন, আল্লাহর কসম! এ হাদীস তো আমি এই মাত্র শুনলাম। (এ হাদীস তো ইতিপূর্বে কখনো কারো নিকট হতে শুনিনি!)

অতঃপর ওয়ায শেষে আহমাদের ইঙ্গিতে ইয়াহয়া তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাকে কে হাদীস বর্ণনা করেছেন বললেন? বলল, আহমাদ বিন হাম্বল ও ইয়াহয়া বিন মাঈন। ইয়াহয়া বললেন, আমিই হলাম ইয়াহয়া, আর ইনি হলেন আহমাদ। আমরা তো আল্লাহর রসূলের এ ধরনের হাদীস কখনো শুনিনি। আপনাকে যদি এই শ্রেণীর হাদীস বর্ণনা করতেই হয়, তাহলে আমাদের নাম ছাড়া অন্যের নামে করুন। বক্তা বলল, এতদিন আমি শুনে আসছিলাম যে, ইয়াহয়া বিন মাঈন আহমক। আজ সে কথার বাস্তব প্রমাণ পেলাম। ইয়াহয়া বললেন, তা কি করে? বলল, দুনিয়াতে কি তোমরা দুজন ছাড়া আর কোন ইয়াহয়া বিন মাঈন ও আহমাদ বিন হাম্বল নেই? আমি ১৭ জন আহমাদ বিন হাম্বল ও ইয়াহয়া বিন মাঈন থেকে এসব হাদীস লিখেছি!! *(তা'বীলু মুখতালাফিল হাদীস ৩৫৭পৃঃ, আস্‌সুন্নাহ অমাকানাতুহা ফিত্‌ তাশরীইল ইসলামী ৮৬পৃঃ)*

কিন্তু তা হলে কি হয়? সাধারণ মানুষ তো এই শ্রেণীর বক্তাদের অন্ধভক্ত। তাদের বিরুদ্ধে কোন হক্কানী আলেম কিছু মন্তব্য করলেই জাহেল লোকেরা ক্ষেপে উঠবে এবং বক্তার সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা করে ঐ আলেমকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে ছাড়বে।

একদা বাগদাদে এক বক্তা ওয়ায করতে গিয়ে

﴿ عَسَىٰٓ أَن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامٗا مَّحۡمُودٗا ٧٩ ﴾ (   )

অর্থাৎ, আশা করা যায়, তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রেরিত করবেন মাক্বামে মাহমূদে (প্রশংসিত স্থানে)। *(সূরা ইসরা ৭৯ আয়াত)*

এই আয়াতের তফসীর বর্ণনা করে বলল, নবী ﷺ আল্লাহর সাথে তাঁর আরশে বসবেন!

এ খবর গেল (বড় মুফাস্‌সির) মুহাম্মাদ বিন জারীর ত্বাবারীর কাছে। তিনি বক্তার ঐ তফসীর শুনে রাগান্বিত হয়ে ঘোর প্রতিবাদ জানালেন। আর অধিক তাকীদের জন্য তিনি তাঁর বাড়ির দরজায় লিখে দিলেন, 'পবিত্র সেই আল্লাহ; যাঁর কোন সান্ত্বনাদাতা সাথী নেই এবং তাঁর আরশে বসার কোন সঙ্গী নেই।'

কিন্তু বাগদাদের জনতা তাঁর উপর ক্ষেপে গিয়ে তাঁর বাড়ির উপর পাথর মারতে শুরু করল। পরিশেষে পাথরের নিচে তাঁর বাড়ির দরজা চাপা পড়ে বন্ধ হয়ে গেল! *(তফসীর ত্বাবারীর ভূমিকা ১১পৃঃ, আল-ইসলামু অল-হাযারাহ ২/৫৫৯, আস্‌সুন্নাহ অমাকানাতুহা ফিত্‌ তাশরীইল ইসলামী ৮৬-৮৭পৃঃ)*

বলাই বাহুল্য যে, বর্তমানেও ঐ শ্রেণীর বক্তাদেরই আসন রয়েছে সাধারণ মানুষের মনে। যারা উয বিন উনুকের কাহিনী, নূহের তুফানের সময় গু' মেখে বুড়ির যুবতী হওয়া কথা, তুফানের সময় নূহের কিশ্তী কা'বা তওয়াফ করে দু' রাকআত নামায পড়ার কথা, তুফানে কিশ্তীতে উঠে আসা প্রাণী ছাড়া সকলের ধ্বংস হওয়া কিন্তু কিশ্তীতে না চড়েও এক বুড়ির বেঁচে থাকার কথা, মি'রাজের সময় বুরাকের কথা বলার কাহিনী, এক ইয়াহুদীর মি'রাজ অবিশ্বাসের ফলে বউকে মাছ কাটতে দিয়ে নাইতে গিয়ে যুবতী হয়ে বিবাহ করে সন্তান দেওয়া ও পরে আবার পুরুষ হয়ে ফিরে এসে বউকে সেই মাছ কাটতেই দেখার কাহিনী ইত্যাদি শুনিয়ে সাদা মানুষের মন এমন লুটে নিয়েছে যে, তাদের বিরুদ্ধে কোন মন্তব্যই শুনতেই রাযী নয় জনসাধারণ। ফাল্লাহুল মুস্তাআ'ন।

(৫) মযহাবী মতভেদ ঃ

জাহেল মযহাবধারীরা নিজেদের মযহাবের কথা সাব্যস্ত করার জন্য জাল

করেছে বহু হাদীস। যেমন ঃ-

'যে ব্যক্তি নামাযে (রুকূর আগে ও পরে) রফয়ে য়্যাদাইন করবে, তার নামায হবে না।'

'যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়বে, তার মুখে আগুন ভরা হবে।'

'যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়বে, তার নামায হবে না।'

'তিনি ২০ রাকআত তারাবীহ ও বিতর পড়তেন।'

'নাপাকীর গোসলের সময় তিনবার করে কুল্লী করা ও নাকে পানি দেওয়া ফরয।'

'জিবরীল কা'বার নিকট আমার ইমামতি করলে বিসমিল্লাহ সশব্দে পড়েছিলেন।'

'যে বলবে যে কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি সে কাফের। --- তার বিবির তালাক হয়ে যাবে।' ইত্যাদি

এক বিদআতী বিদআত থেকে তওবা করার পর স্বীকার করেছে এবং বলেছে যে, 'তোমরা এ হাদীস কার নিকট থেকে গ্রহণ করছ, তা বাচ-বিচার করে দেখো। যেহেতু আমরা যখন কোন রায়কে সঠিক বলে ধারণা করতাম, তখনই সেটাকে প্রমাণ করার জন্য হাদীস তৈরী করতাম!' *(তাদরীবুর রাবী ১/২৫৫)*

(৬) কল্যাণের আশা পোষণের সাথে সাথে দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা ঃ

অনেক আবেদ, সূফী ও নেক লোকেরাও ভালো নিয়তে অনেক হাদীস রচনা করেছে। কোন সওয়াবের কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য অথবা কোন পাপ কাজে ভীতিপ্রদর্শন করার জন্য হাদীস তৈরী করে প্রচার করেছে। আর তাতে আল্লাহর কাছে সওয়াবেরও আশা রেখেছে। তারা ভেবেছে যে, এ কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হবে এবং ইসলামের খিদমত হবে।

তারা ভেবেছিল, আল্লাহর রসূল ﷺ-কে এ কথা বলে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি বলে যাননি। আমরা তাঁর তরফ থেকে বলে মানুষকে হেদায়াতের পথে উৎসাহিত করছি। তাতে তো সওয়াব হওয়ারই কথা।

যখন উলামায়ে কিরাম তার প্রতিবাদে "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন নিজের ঠিকানা দোযখে বানিয়ে নেয়।" আল্লাহর রসূল ﷺ-এর এই হাদীস দিয়ে উপদেশ দিতে গেছেন, তখন তারা বলেছে, আমরা তো তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছি না। আমরা বরং তাঁর জন্যই (দ্বীনের বৃহৎ স্বার্থেই) মিথ্যা বলছি। তাছাড়া মিথ্যা আরোপ করার মানে হল, তাঁকে কবি অথবা পাগল বলা। আমরা তো তা বলছি না।

অথচ এমন খোঁড়া অজুহাত ও বাজে অপব্যাখ্যা যে শরীয়তে অচল তা বলাই বাহুল্য।

নূহ বিন আবী মারয়্যাম কুরআনের এক একটি সূরার ফযীলত বর্ণনা করে বহু হাদীস রচনা করার কথা স্বীকার করেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে জবাবে বলল, যখন আমি দেখলাম, লোকেরা কুরআন থেকে বৈমুখ হয়ে আবূ হানীফার ফিক্‌হ ও ইবনে ইসহাকের মাগাযী (যুদ্ধের ইতিহাস) নিয়ে বিভোর রয়েছে, তখন আমি (লোকদেরকে কুরআন পঠন-পাঠনের প্রতি উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে) ঐ সকল হাদীস বানিয়ে তাদের মাঝে প্রচার করেছি।

মুআম্মাল বিন ইসমাঈল বলেন, একদা এক শায়খ আমাকে কুরআনের এক একটি সূরার ফযীলত সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাকে এ সকল হাদীস কে বর্ণনা করেছে? তিনি বললেন, মাদায়েনের এক লোক; তিনি এখনো জীবিত আছেন।

সত্যতা যাচাই করার জন্য আমি মাদায়েন সফর করে সেই লোকের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাকে এ সকল হাদীস কে বর্ণনা করেছে? বললেন, ওয়াসেতের এক লোক এবং তিনি এখনো বেঁচে আছেন। সেখানে গিয়ে একই কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, বাসরার এক লোক। বাসরায় গিয়ে ঐ প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, আব্বাদানের এক লোক। সেখানে গিয়ে প্রশ্ন করলাম, আপনাকে এ সকল হাদীস কে বর্ণনা করেছে? তিনি আমার হাত ধরে একটি ঘরে প্রবেশ করালেন। সেখানে দেখলাম, একদল সূফী এবং তাদের একজন শায়খ বসে আছেন। তিনি তাঁর প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, এই

শায়খ আমাকে ঐ হাদীসগুলি বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, শায়খ! আপনাকে এ সকল হাদীস কে বর্ণনা করেছে? উত্তরে তিনি বললেন, কেউ বর্ণনা করেনি। আমরা যখন লক্ষ্য করলাম যে, লোকেরা কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তখন ঐ সকল হাদীস রচনা করলাম! *(আল-মাউযূআত ১/২৩৯, তাদরীবুর রাবী ১/২৫৮-২৫৯)*

গোলাম খালীল নামক প্রসিদ্ধ এক যাহেদ, আবেদ ও পরহেযগার জনপ্রিয় লোক ছিলেন। তিনি যখন মারা যান, তখন তাঁর শোকে বাগদাদের সমস্ত বাজার বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু শয়তানের চক্রান্তে তিনিও যিক্‌র-আযকারের ফযীলতে বহু হাদীস রচনা করেছেন।

একদা তাঁকে প্রশ্ন করা হল যে, হৃদয় গলানোর জন্য উপদেশমূলক যে সকল হাদীস আপনি বর্ণনা করছেন, সেগুলি কোথায় পেলেন? উত্তরে তিনি বললেন, মানুষের মনকে নরম করার জন্য সেগুলি আমরা রচনা করেছি।

তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁকে বলা হল, আপনি কি আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখেন? বললেন, সুধারণা কেন রাখব না? আমি যে আলীর ফযীলতে ৭০টি হাদীস তৈরী করেছি। *(তাদরীবুর রাবী ১/২৫৪)*

(৭) বাদশা ও আমীরদের মনোরঞ্জন ঃ

পুরস্কারের লোভে অথবা কিছু পাওয়ার আশায় কিছু লোক বাদশা-আমীরদের তোষামদ করত। কবিরা যেমন কবিতা রচনা করে পারিতোষিক লাভ করত, তেমনি কিছু হাদীস-ওয়ালাও জাল হাদীস রচনা করে রাজার মনকে খোশ করে রাজ-পুরস্কার লাভ করার চেষ্টা করত।

একদা গিয়াস বিন ইবরাহীম নামক এক লোক বাদশা মাহদীর দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখল, তিনি কবুতর (পায়রা) উড়িয়ে খেলা করছেন। প্রাসঙ্গিকতা খেয়াল করে সে তাঁকে প্রসিদ্ধ হাদীস শুনাল ঃ-

'তীর, উঁট অথবা ঘোড়া ছাড়া অন্য কিছুতে প্রতিযোগিতা (খেলা) নেই।'

কিন্তু সে ঐ তিন প্রকার প্রতিযোগিতার সাথে মাহদীর বর্তমান প্রতিযোগিতার

‘কবুতর’কেও হাদীসে শামিল করে নিল। আর তা শুনে খোশ হয়ে মাহদী তাকে ১০ হাজার দিরহাম পুরস্কার দিলেন।

কিন্তু সে চলে গেলে বিবেকের কামড়ে কবুতরগুলিকে যবাই করতে আদেশ দিয়ে তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমার পৃষ্ঠদেশ হল এক মিথ্যুকের। *(তাদরীবুর রাবী ১/২৫৬)*

বলাই বাহুল্য যে, সে যুগের কিছু রাজা-বাদশারাও হাদীস জাল করার ব্যাপারে এক প্রকার সহযোগিতা করেছেন। সুতরাং মাহদী যদি ঐ জালী মুহাদ্দিসকে পুরস্কৃত না করে তিরস্কৃত করতেন, তাহলে অবশ্যই সে দ্বিতীয় আর কোন হাদীস জাল করতে উদ্বুদ্ধ হতো না।

একদা অনুরূপ এক জালী মুহাদ্দিস মুকাতিল বিন সুলাইমান বালখী তাঁর কাছে প্রস্তাব রেখে বলল যে, আপনি চাইলে আমি আপনার জন্য তথা আব্বাস ও তাঁর বংশধরের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীস রচনা করব। এ প্রস্তাব শুনে তিনি কেবল বলেছিলেন, ‘আমার তাতে কোন প্রয়োজন নেই।’ কিন্তু ঐ মিথ্যাবাদিতার কোন প্রতিবাদ করেননি।

এইভাবে কত খলীফা ও বাদশার দরবার তথা মসজিদে মসজিদে বক্তারা কত শত বানানো গল্প ও কেস্সা-কাহিনী শুনিয়ে গেছে, কিন্তু তাঁদের জানা সত্ত্বেও এবং প্রতিবাদ ও প্রতিহত করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা তা করেননি। ফলে জাল হাদীসের প্রচার ও প্রসার লাভে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়নি।

(৮) ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা ঃ

এমন কিছু স্বার্থপর লোক ছিল, যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য হাদীস রচনা করেছে। স্বার্থে আঘাত লাগলে সাথে সাথে ঝাল ঝাড়ার জন্য হাদীস রচনা করে ফেলেছে। নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করার মানসে হাদীস তৈরী করে প্রচার করেছে।

একদা সা’দ বিন তুরাইফের ছেলে কাঁদতে কাঁদতে তার কাছে এল। কোন দোষে ছেলেটিকে তার উস্তাদ মেরেছিল। ছেলের প্রতি স্নেহপরবশ হয়ে ঐ

শিক্ষকের উপর ঝাল ঝাড়তে গিয়ে রচনা করে ফেলল হাদীস; বলল, ‘---- আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “তোমাদের শিশুদের শিক্ষকরা তোমাদের মধ্যে মন্দ লোক। তারা এতীমের প্রতি সবার থেকে কম দয়া প্রদর্শন করে থাকে এবং মিসকীনের প্রতি সবার থেকে বেশী কঠোর হয়।”

নবুঅতের দাবী করে ফায়দা লুটার জন্য তৈরী করতে হয়েছে জাল হাদীস। নকল নবী মুহাম্মাদ বিন সাঈদ মাসলূব জানত যে, শেষ নবী নবুঅতের দরজা বন্ধ হওয়ার কথা ঘোষণা করে গেছেন। আর সে ক্ষেত্রে তার দাবীকে লোকেরা মিথ্যা বলে মনে করবে। তাই সে ঐ ঘোষণাকে বাতিল করার জন্য রচনা করল, আনাস থেকে বর্ণিত আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন, “আমিই শেষ নবী; আমার পর আর কোন নবী নেই। তবে আল্লাহ চাইলে হতে পারে।”

(৯) ব্যবসায় অধিক বিক্রয় ও লাভের আশায়, নির্দিষ্ট ধরনের পোশাক, সুগন্ধি, শস্য ও ফল-ফসলের মাহাত্ম্য বর্ণনা ঃ

“বেগুন সর্বরোগের ঔষধ।”

“চাল মানুষ হলে ধৈর্যশীল হতো, কোন ক্ষুধার্ত খেলে তাকে পরিতৃপ্ত করে।”

“তোমরা মসুর খাও। কেননা তা বর্কতময়, হৃদয়কে নম্র করে এবং অশ্রু বৃদ্ধি করে। সত্তর জন নবী এর পবিত্রতা বর্ণনা করেছেন।”

“ডিম ও পিয়াজ খেলে সন্তানহীনের সন্তান হয়।”

“তোমরা পায়জামা পরিধান কর। কারণ, তা হল অধিক পর্দাশীল পোশাক--।”

(১০) ভক্তিভাজনের ভক্তিবর্ধন

মহানবী ﷺ প্রত্যেক মুসলিমের ভক্তিভাজন। তাঁর যে মর্যাদা আমাদের কাছে আছে, কুরআন ও সহীহ সুন্নায় তাঁর যে সকল মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে তার থেকে অধিক মর্যাদা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করার জন্য আর অন্য কোন দলীলের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বিকৃত-প্রকৃতির এক শ্রেণীর মানুষ তাঁর প্রতি ভক্তিতে অতিরঞ্জন করে রচনা করেছে ভক্তিমূলক নানা জাল হাদীস। যেমন ঃ-

“আল্লাহ সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন।”

"(আল্লাহ বলেন, হে নবী!) তুমি না হলে আমি জগৎ সৃষ্টি করতাম না।"

"আদম যখন ত্রুটি করে বসলেন তখন তিনি বললেন, 'হে প্রতিপালক! আমি মুহাম্মাদের অসীলায় প্রার্থনা করছি আমাকে ক্ষমা করে দাও----।"

"তোমরা আমার মর্যাদার অসীলায় (করে দুআ) কর।"

"যে ব্যক্তি হজ্জ করল, অথচ আমার (কবর) যিয়ারত করল না সে আমার প্রতি দুর্ব্যবহার করল।"

"যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পর আমার কবর যিয়ারত করল, সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করল।"

"তোমরা আমার মর্যাদার অসীলায় (করে দুআ) কর।"

তদনুরূপ যে যাঁর প্রতি ভক্তি রেখেছে, সে তাঁর ফযীলতে রচিত হাদীস বর্ণনা করে ভক্তির পরিধি বর্ধন করে নিয়েছে।

জাল হাদীস ধরা পড়ে কিভাবে?

হাদীসে ভেজাল অনুপ্রবেশ করতে শুরু করলে সেই ভেজাল ধরার জন্য মহানবী ﷺ-এর হাদীস-প্রিয় উলামাগণ 'ল্যাক্টোমিটার' যন্ত্রের মত বিভিন্ন ভেজাল-নির্দেশক পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন।

হাদীসে মহানবী ﷺ-এর মূল কর্ম অথবা বক্তব্যকে 'মতন' এবং বর্ণনাকারীদের সূত্রকে 'সনদ' বলা হয়। উলামাগণ উভয় দিককে সামনে রেখে নানাভাবে পরখ ও বাচ-বিচার শুরু করলেন।

সাহাবাগণ একে অপরকে অবিশ্বাস করতেন না। কোন তাবেঈও কোন সাহাবীর ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করতেন না। কিন্তু যখন উম্মাহর মাঝে ফিতনা দেখা দিল, তখন আব্দুল্লাহ বিন সাবা নামক ইয়াহুদী মুনাফিক নিজের মনে সঞ্চিত বিষ উদ্‌গার করতে সুযোগ পেয়ে গেল। এই খবীসের বিষ মাখা দলের লোক হযরত আলী ﷺ-কে মাবূদ মেনে নিতে লাগল। আহলে বায়তের মহব্বতের নামে ইসলামের ভিতরে ভেজাল প্রক্ষিপ্ত করতে প্রয়াস

লাভ করল।

এক্ষণে সাহাবা ও তাবেঈনগণ হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে শুরু করলেন। যাদেরকে ভালোরূপে চিনেন কেবল তাদের নিকট থেকেই হাদীস গ্রহণ করতে লাগলেন।

(১) সনদ ছাড়া হাদীস গ্রহণ বন্ধ হয়ে গেল।

ইবনে সীরীন বলেন, 'ওঁরা সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন না। অতঃপর যখন ফিতনা শুরু হল, তখন ওঁরা বললেন, আপনারা (কাদের নিকট থেকে শুনেছেন তাদের) নাম উল্লেখ করুন। সুতরাং আহলে সুন্নাহ বলে জানা গেলে তাঁদের নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করা হতো। আর আহলে বিদআহ (বিদআতী) বলে জানা গেলে তাদের নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করা হতো না।'

একদা বাশীর আদবী ইবনে আব্বাসের নিকট এসে হাদীস বর্ণনা করতে শুরু করলেন। কিন্তু ইবনে আব্বাস তাঁর হাদীসের প্রতি কর্ণপাত করছেন না দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার? আমি আল্লাহর রসূল ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করছি, অথচ আপনি তার প্রতি কান করছেন না।' ইবনে আব্বাস বললেন, 'আমরা যখন কারো নিকট থেকে একবার শুনেছি যে, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন তখন সত্বর তার প্রতি আমাদের চোখ ও কান খাড়া রেখে শ্রবণ করেছি। কিন্তু লোকেরা যখন ভালো-মন্দ (সব রকম পথ) অনুসরণ করতে লাগল, তখন একান্ত পরিচিত ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করি না।'

হাদীসে মিথ্যাবাদিতা প্রকাশ পেলে তাবেঈনগণও সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। আবুল আলিয়াহ বলেন, 'আমরা কোন হাদীস কোন সাহাবী থেকে বর্ণিত শুনলে সওয়ার হয়ে তাঁর নিকট থেকে সরাসরি শুনে সে কথার সত্যতা যাচাই করা ছাড়া সন্তুষ্ট (নিশ্চিন্ত) হতে পারতাম না।'

ইবনুল মুবারক বলেন, 'সনদ হল দ্বীনের একটি অংশ। সনদ না থাকলে যার যা ইচ্ছা, সে তাই বলত।' *(সহীহ মুসলিমের ভূমিকা দ্রঃ)*

(২) দূর-দূরান্তে সফর করেও হাদীসের সত্যতা যাচাই করা

শুরু হল।

হাদীসের সত্যতা যাচাই করার জন্য সরাসরি হাদীস বর্ণনাকারীর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হল। কিছু সাহাবা এবং বহু তাবেঈন এ মর্মে এক দেশ থেকে অন্য দেশে দিনের পর দিন সফর করতে লাগলেন। হাদীসের সত্যতা জানার জন্য জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﵁-এর শাম দেশ সফর এবং আবূ আইয়ুব ﵁-এর মিসর সফর করার কথা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।

সাঈদ বিন মুসাইয়েব বলেন, 'আমি মাত্র একটি হাদীসের জন্য বহু দিন ও রাত্রি ধরে সফর করেছি।' আর এইরূপই করেছেন বহু মুহাদ্দেসীনে কিরামগণ।

(৩) বর্ণনাকারীকে নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে হাদীসের সত্যতা যাচাই করা শুরু হল।

এ মর্মে মুহাদ্দেসীনগণ বর্ণনাকারীদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হতে লাগলেন। তাদের জীবনেতিহাস ও গুপ্ত-প্রকাশ্য সকল বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা ও সমীক্ষা আরম্ভ করলেন। দ্বীনের বৃহত্তর স্বার্থে এ কাজ করতে তাঁরা অকুতোভয়ের ভূমিকা পালন করলেন। এ ব্যাপারে তাঁরা হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনী লিখলেন। কারো সমালোচনা করতে এবং কাউকে মিথ্যুক বলতে ভয় করলেন না। কারণ, এ কাজে তাঁরা দ্বীনের বৃহত্তর স্বার্থেই; দ্বীনের মধ্যে ভেজালের অনুপ্রবেশ-পথ বন্ধ করতেই হাত দিয়েছিলেন।

কার নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে এবং কার নিকট থেকে যাবে না, সে ব্যাপারে তাঁরা বিভিন্ন নিয়ম-নীতি তৈরী করে দিলেন।

যারা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর প্রতি একবার মিথ্যা আরোপ করেছে, তাদের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

যারা সাধারণ লেনদেনের ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলে, তাদের হাদীস গ্রহণ করা যাবে না।

বিদআতী ও খেয়াল-খুশীর পূজারী (যারা নিজের জ্ঞান ও বিবেক দ্বারা কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা করে এবং নিজেদের বিবেক ও ইচ্ছামত কোন মত

পোষণ করার পর কুরআন ও সুন্নাহ থেকে তার দলীল খোঁজে সে রকম) লোকদের বর্ণিত হাদীস নেওয়া যাবে না।

যারা যিনদীক, ফাসেক ও গাফেল মানুষ তাদের নিকট থেকেও হাদীস বর্ণনা করা যাবে না।

আর এ সব জানার জন্য তাঁরা বড় বড় গ্রন্থ রচনা করলেন। হাদীস বর্ণনাকারীদের অবস্থা নিয়ে বিস্তারিত রচিত গ্রন্থাবলীকে বলা হয়, কুতুবুর রিজাল ও কুতুবুল জারহি অত্‌তা'দীল। আর এ বিষয়টি হল, ইলমুর রুয়াত বা ইলমুর রিজাল (রিজাল-শাস্ত্র)।

হাদীস সহীহ অথবা যয়ীফ তা জানার জন্য রচনা করলেন বিভিন্ন নিয়ম-কানুন ও সূত্রের বই-পুস্তক; যা আমাদের নিকট 'ইলমু মুস্তালাহিল হাদীস' নামে পরিচিত।

সহীহ ও যয়ীফের মাঝে তমীয করে হাদীস গ্রন্থ রচনা করলেন।

কিছু গ্রন্থ লিখা হল কেবল সহীহ হাদীস নিয়ে। যেমন, ইমাম বুখারী ও মুসলিম সঞ্চয়ন করলেন দুটি বড় বড় গ্রন্থ; যে দুটি এক কথায় 'সহীহায়ন' নামে প্রসিদ্ধ।

এখানে একটি কথা বলে রাখা ভালো যে, বুখারী শরীফের সমস্ত হাদীস সহীহ বলতে যে হাদীসগুলি ইমাম বুখারী সনদসহ 'ক্বালা হাদ্দাষানা' বলে উল্লেখ করে বর্ণনা করেছেন সেগুলির সবটাই সহীহ। কিন্তু হাদীসের শিরোনামে তিনি কিছু কিছু যয়ীফ হাদীস উল্লেখ করেছেন। তা শুধু এই বলে সতর্ক করার জন্য যে, উল্লেখিত এ হাদীসটি সহীহ নয় অথবা এটি সহীহ হাদীস বিরোধী। অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে তা উল্লেখিত হয়েছে, যা হাদীসের ছাত্ররা সহজেই অনুমান করতে পারে।

পক্ষান্তরে কিছু গ্রন্থ প্রণীত হল সহীহ ও যয়ীফ উভয় নিয়ে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে বলে দেওয়া হল যে, এই হাদীসটি যয়ীফ, অথবা বিরল, অথবা সহীহ হাদীস বিরোধী, অথবা দলীলের অযোগ্য ইত্যাদি। যেমন, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ; যেগুলি এক কথায় 'সুনানে আরবাআহ'

নামে প্রসিদ্ধ।

উপরে উল্লেখিত মোট ছয়টি গ্রন্থকে এক কথায় 'কুতুবে সিত্তাহ' বলা হয়। বলা বাহুল্য, প্রচলিত 'সিহাহ সিত্তাহ' কথাটি ভুল। কারণ, সুনানে আরবাআর মধ্যে যয়ীফ ও জাল হাদীসও বর্তমান।

কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছে কেবল জাল হাদীসকে কেন্দ্র করে। মানুষকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে লোকমুখে প্রচলিত ও প্রচারিত যে সকল হাদীস আসলে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর হাদীস নয়, তা জানিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ঐ সকল গ্রন্থ রচনা করেন উলামাগণ।

যত দিন যায় হাদীস নিয়ে গবেষণা তত আরো বেড়ে চলে। যুগে যুগে কালে কালে মুহাদ্দিসগণ হাদীসের ভেজাল রুখার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস শায়খ নাসেরুদ্দীন আলবানী (রঃ) হাদীসের বড় খিদমত করে গেছেন। হাদীসের সিংহভাগকেই তিনি চিহ্নিত করে গেছেন এই বলে যে, এটি সহীহ, এটি যয়ীফ এবং এটি জাল।

সে সব হাদীস পৃথক পৃথক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে কম্পিউটারায়ত্ত হওয়াতে আরো সহজ হয়েছে সহীহ হাদীস জেনে আমল করার ব্যাপার।

তবুও সতর্কতার বিষয় যে, মহানবী ﷺ বলেন, "শেষ যামানায় অনেক ধোকাবাজ মিথ্যুক লোক হবে। তারা তোমাদের নিকট এমন এমন হাদীস নিয়ে উপস্থিত হবে, যা তোমরা শুনে থাকবে না এবং তোমাদের বাপ-দাদারাও না। সুতরাং তোমরা সেই সব লোক থেকে সাবধান থেকো; যেন তারা তোমাদেরকে ভ্রষ্ট না করে এবং ফিতনায় না ফেলে দেয়।" *(মুসলিম, মিশকাত ১৫৪নং)*

হাদীস যয়ীফ কেন?

একই উস্তাযের ছাত্র বিভিন্ন মানের হয়ে থাকে। কেউ থাকে প্রখর বুদ্ধিমান ও স্মৃতিশক্তিমান, আবার কেউ হয় নিরেট বোকা। কেউ মুখস্থ করে অনেক দিন যাবৎ মনে রাখতে পারে, আবার কারো বা মুখস্থই হয় না। কেউ নিজের বই-খাতার প্রতি অতি যত্নবান হয়, কেউ অবহেলায় তা নষ্ট করে ফেলে। হাদীসের ছাত্ররাও অনুরূপ। যাঁরা ভালো ছাত্র তাঁদের হাদীস সহীহ ও সচল। কিন্তু ঐ শ্রেণীর যাঁরা খারাপ ছাত্র তাঁদের হাদীস দুর্বল ও অচল।

মোটামুটি কয়েকটি কারণে হাদীস দুর্বল হয়ঃ-

(১) হাদীসের বর্ণনা-পরম্পরায় কোন বর্ণনাকারী ফাসেক, অবিশ্বস্ত বা অনির্ভরযোগ্য হলে।
(২) কোন দুর্বল-স্মৃতির বর্ণনাকারী থাকলে।
(৩) রিজাল-সূত্র কোন জায়গায় ছিন্ন থাকলে।
(৪) বর্ণনায় অপেক্ষাকৃত উত্তম বর্ণনাকারীর বিরোধিতা থাকলে।
(৫) অন্য কোন হানিকর দোষ বর্তমান থাকলে।

এ ছাড়া এমন র্বণনাকারী, যার নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা বিতর্কিত, যে হাদীস বর্ণনায় অনেক ভুল করেছে এবং নির্ভরযোগ্য প্রসিদ্ধ বর্ণনাকারীদের বর্ণনায় বিরোধিতা করেছে, শেষ জীবনে যার স্মৃতি-বিকৃতি ঘটেছে এবং তার পরে হাদীস বর্ণনা করেছে, যার নির্ভরযোগ্য কিতাব নষ্ট হয়ে গেছে এবং তার পরে নিজের স্মৃতি থেকে হাদীস বর্ণনা করেছে, যে বাচ-বিচার না করে সবল-দুর্বল সকল বর্ণনাকারীর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছে, তার হাদীস গ্রহণ করার ব্যাপারেও মুহাদ্দেসীনগণ বড় সতর্কতা অবলম্বন করেছেন এবং এই শ্রেণীর বর্ণনাকারীদের হাদীস যে সহীহ নয়, তা চিহ্নিত করেছেন।

সুতরাং আমাদের উচিত, দুর্বল ও ভেজালমার্কা হাদীস বাদ দিয়ে সবল ও বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা আমল করা। আমাদের কেউ যখন ব্যবহারিক কোন জিনিস ক্রয় করতে যাই, তখন বড় সতর্কতার সাথে দুর্বল ও ভেজাল দেখলে তা বর্জন করে মজবুত ও খাঁটি জিনিসই গ্রহণ করি। তাহলে এই সতর্কতা কি দ্বীনের ব্যাপারে, আমাদের ঈমান ও আমলের ব্যাপারে অধিক জরুরী নয়?

আল্লাহ আমাদের সকলকে হেদায়াত করুন। আমীন।

وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين.